মায়ের ডাক

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

'প্রহেলিকা-সিরিজে'র চত্বারিংশ গ্রন্থ

মায়ের ডাক

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত পাঠাগার

www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

বাংলা বইয়ের স্বর্ণখনি আমার সংগ্রহে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো নতুন করে স্ক্যান না করে পুরনোগুলো বা এডিট করে নতুন ভাবে দেবো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো স্ক্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দ্যেশ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই বৃহত্তর পাঠকের কাছে বই পড়ার অভ্যেস ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের বই আমি শেয়ার করব। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু অস্টিমাস প্রাইম ও পি. ব্যান্ডস কে - যারা আমাকে এডিট করা নানা ভাবে শিখিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রয়াস পুরোনো বিস্মৃত পত্রিকা নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা। আগ্রহীরা দেখতে পারেন www.dhulokhela.blogspot.in সাইটটি।

আপনাদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন - *subhajit819@gmail.com*.

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লেগে থাকে, এবং বাজারে হার্ড কপি পাওয়া যায় - তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল। হার্ড কপি হাতে নেওয়ার মজা, সুবিধে আমরা মানি। PDF করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষণ এবং দূর দূরান্তের সকল পাঠকের কাছে পৌছে দেওয়া। মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge, No poverty like ignorance

SUBHAJIT KUNDU

দেব-সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা, হইতে
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক
প্রকাশিত

দাম—এক টাকা

শ্রাবণ—১৩৫৮

দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হ
এস্. সি. মজুমদার কর্তৃক
মুদ্রিত

এইভাবে মুখ নড়ছে তাঁর

বেলা ন'টা। দোতলার খোলা ছাদে দু'খানি বেতের চেয়ারে মুখোমুখি ব'সে আছেন প্রতাপ রায় এবং রণদা মল্লিক। প্রতাপবাবুই কথা কইছিলেন। মাঝে-মাঝে গলা ধ'রে আসছে তাঁর। অতি কষ্টে আত্মসংযম করছেন ভদ্রলোক। কথার খেই হারিয়ে যাচ্ছে মাঝে-মাঝে। অনেক চেষ্টায় কাহিনীর ছিন্ন-সূত্র খুঁজে এনে জোড়াতালি দিয়ে নিজের বক্তব্য তিনি রণদা মল্লিককে বোঝাতে চাইছেন।

—"পুলিশ অবশ্য চেষ্টা করবে, চেষ্টা করাই পুলিশের কাজ; কিন্তু ধরুন, মানুষ চুরি অনেকগুলো হলো এ-যাবৎ এই সহরে। তিন মাসের ভিতর পঞ্চাশটা অন্ততঃ। কই, একটারও তো কিনারা হলো না! তাই, শুধু পুলিশের উপর ভরসা ক'রে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারছি না। বে-সরকারী গোয়েন্দা বলতে আপনারই নামডাক বেশী আজকাল, তাই পুলিশকে আর আপনাকে প্রায় একসঙ্গেই খবর দিয়েছি আমি।"

—"খুবই ভালো কাজ করেছেন"—ব'লে উঠলেন রণদা মল্লিক। সাধারণতঃ আমাদের কথা লোকে স্মরণ করে—ঘটনা ঘটবার ঢের দিন পরে, পুলিশ যখন হালে পানি না পেয়ে মৌনব্রত অবলম্বন করে, তখন। অত পরে কার্য্যক্ষেত্রে নেমে আমরা না-পাই কোনো সূত্র আবিষ্কার করতে, না-পারি কোনো সাক্ষীপ্রমাণের নাগাল ধরতে। এ-ক্ষেত্রে ডেপুটী-কমিশনার আর আমি সমানই সুযোগ পেয়েছি। তিনি যা

দেখেছেন, আমিও তা দেখলাম। এখন তাঁর কাজ তিনি করুন, আমার কাজ আমি করি। দরকার হ'লে পরস্পরের সহযোগিতা আমরা পাবো এবং নেবো।"

—"কিন্তু, কি বুঝলেন?" হতাশ-করুণ-কণ্ঠে প্রতাপ রায় জিজ্ঞাসা করলেন—"কিছু বুঝতে পারলেন কি? এ-যাবৎ লোক চুরি হয়েছে, রাস্তা থেকে বা গরীবের খোলার ঘর থেকে। আমার এ-বাড়ীতে দরোয়ান আছে ত্রিশ জন। সারারাত্রি বন্দুক নিয়ে টহল দিচ্ছে সান্ত্রীপাহারা। তেতলায় ছেলে থাকে ঠিক আমার পাশের ঘরটিতে। মাঝের দরজা খোলা থাকলে, একই ঘর। এবং কাল এ-দরজা খোলাই ছিল রাত্রে। সারারাত্রি আমরা অঘোরে ঘুমিয়েছিলাম, আমি ও আমার স্ত্রী। ছেলের ঘর থেকে টু শব্দটি শুনিনি কেউ। সকালে উঠে দেখি—ছেলে নেই। দালানে ঝি থাকে একজন। তাকে না মাড়িয়ে কেউ সিঁড়ির মুখে আসতে পারে না। সে ঝিও টের পায়নি কিছু।"

উত্তেজনায় ও আবেগে প্রতাপবাবু আপাদমস্তক কাঁপছিলেন থর্-থর্ ক'রে। রণদা নিস্তব্ধ হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। উনি একটু ঠাণ্ডা না হ'লে তো কোনো কথা ব'লে লাভ নেই!

অবশেষে প্রতাপবাবু কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলেন। মাঝে-মাঝে এক-একবার শুধু বুকটা কেঁপে-কেঁপে উঠছিল তাঁর। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন—"রণদাবাবু! কী বলেন

আপনি ?···আমাকে বলতেই হবে !···খোকাকে কি আর ফিরে পাবো না ?"

গম্ভীর বিষণ্ণ-কণ্ঠে উত্তর দিলেন রণদা—"আমি প্রাণপণ চেষ্টা করবো প্রতাপবাবু ! তবে, মিথ্যা আশা দিয়ে তো লাভ কিছু নেই ! আপনার মত বিচক্ষণ লোকের কাছে বাজে-কথা বলা তো শুধু বোকামী মাত্র !"

প্রতাপবাবু এ-কথার উত্তরে কী যেন আবার বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে তেতলা থেকে নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদ শুনে ওঁরা দুজনেই সচকিত হয়ে উঠলেন। প্রতাপ-বাবু ঝটিতি চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন—"আমার স্ত্রী কেঁদে উঠলেন। আমি দেখি একবার !" বলেই দ্রুতপদে তেতলার পানে ছুটলেন তিনি।

অনাহূত রণদা উপস্থিত ক্ষেত্রে প্রতাপবাবুর অনুসরণ করা সমীচীন মনে করলেন না। শোকাহতা জননীর পুত্রশোক, যে-কোনো কারণেই, যে-কোনো মুহূর্ত্তে উদ্বেল হয়ে ওঠা সম্ভব ও স্বাভাবিক। এবং সে-রকম মুহূর্ত্তে বাইরের লোকের উপস্থিতি শুধু অশোভন নয়, বিরক্তিকরও। সুতরাং চুপ-চাপ চেয়ারে বসেই রইলেন তিনি।

চেয়ারে ব'সে-ব'সে চক্ষু মুদে রণদা আগাগোড়া পর্য্যালোচনা করতে সুরু করলেন ব্যাপারটা। খোকারাজার শয়নকক্ষে কোথাও কোনো হুটোপাটি বা ধস্তাধস্তির লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়নি। হাতির দাঁতের ছোট্ট পালঙ্কখানির উপর এক-হাত

চুল, রাণীমার মাথা থেকে মশারির গায়ে জড়িয়ে গিয়েছিল, এবং ধোপার পাটের আছাড়ি-বিছাড়িতেও তা স্বস্থান থেকে বিচ্যুত হয়নি !···এটা কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু একটা জিনিসের তো কৈফিয়ৎ খুঁজে পাওয়া যায় না! ধোপার বাড়ী থেকে ফিরে এলো যে চুল, তাতে বিলিতী-কেশতৈলের সৌরভ অটুট থাকবে কি ক'রে ?

অতএব অনিবার্য্য সিদ্ধান্ত—ধোপাবাড়ী যাওয়ার সময়ে এ-চুল ছিল না মশারির গায়ে, জড়িয়ে গেছে সবে কাল—বিছানায় মশারি-খাটানো হবার পরে।

অকস্মাৎ হুড়মুড় ক'রে প্রতাপবাবু এসে পড়লেন ও-ধার থেকে। তিনি ভীষণ বিচলিত, চক্ষু তাঁর রক্তবর্ণ, হাতে তাঁর একখানি কাগজ। কাগজখানা রণদার কোলের উপর ফেলে দিয়ে তিনি হাঁপাতে-হাঁপাতে ব'লে উঠলেন—"দেখুন, দেখুন, রণদাবাবু, চিঠিখানা দেখুন !"

চিঠির মতন ভাঁজ-করা একখণ্ড নীল মোটা কাগজ। তাতে লেখা আছে ঃ

"মা, বাবা !

আমায় আর দেখতে পাবে না তোমরা। তার জন্যে দুঃখ ক'রো না। মহৎ কাজে যারা আত্মোৎসর্গ করে, তাদের জন্যে শোক করা উচিত নয়। মা-কালী তোমাদের শান্তি দেবেন।"

খোকা।

চিঠি প'ড়ে বিস্মিত রণদা জিজ্ঞাসা করলেন—"এ চিঠি কোথা হতে এলো ?"

প্রতাপবাবু বললেন—"সদর-গেটে চিঠির বাক্স আছে আমাদের। ডাক-পিয়নেরা তারই ভিতর ডাকের চিঠি ফেলে যায়। সকালের ডাক, আটটা সাড়ে-আটটায় আসে, কাজেই ন'টা নাগাদ চিঠির বাক্স খোলে জমাদার। তারপর সে চিঠির গাদা নিয়ে যায়, সেরেস্তায়। সেখান থেকে নায়েবমশাই আমার বা আমার স্ত্রীর ব্যক্তিগত চিঠিপত্র উপরে পাঠিয়ে দেন। এ-চিঠি—ডাকের চিঠি নয়, উপরে খাম ছিল না। স্রেফ্ ঐ নীল কাগজখানা ভাঁজ-করা পড়েছিল অন্য-সব চিঠির ভিতরে। উপরে শিরোনামা লেখা দেখুন, শুধু—'মা'। কেউ হাতে ফেলে দিয়ে গেছে এটা চিঠির বাক্সে।"

রণদা শূন্য-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন প্রতাপবাবুর পানে। প্রতাপবাবু তাঁর তরফ থেকে সাড়া না পেয়ে আবার বললেন—"এই চিঠি পেয়েই আমার স্ত্রী ও-রকম চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠেছিলেন।"

রণদা চিঠির কাগজখানা উলটে-পালটে দেখতে লাগলেন, তারপর বললেন—"এ-চিঠি পুলিশের হাতে দেওয়া দরকার। তাঁদের হাতে যখন কেস্ রয়েছে, তখন কোনো-কিছু গোপন করা চলবে না তাঁদের কাছ থেকে। চিঠিটা থানায় পাঠিয়ে দিন, এবং রাণীমার কাছ থেকে আমাকে একটা কথা জেনে দিন। কাল রাত্রে খোকার মশারি খাটানো হয়ে যাবার

পর, রাণীমা ক'বার গিয়েছিলেন সেই বিছানার কাছে, এইটুকু জানতে চাই শুধু।"

প্রতাপবাবু উঠে গেলেন তাঁর স্ত্রীকে এই কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য, এবং দু-তিন মিনিটের ভিতরই ফিরে এসে জানালেন—"খোকার বিছানার কাছে কাল সন্ধ্যা থেকে একবারও যাননি আমার স্ত্রী, কারণ, তিনি মাথাধরায় বড় কষ্ট পাচ্ছিলেন কাল।"

দুই

মনের গতি নাকি, বিদ্যুতের বা শব্দের গতির চাইতেও দ্রুত। কিন্তু ট্যাক্সি চেপে গৃহের পানে ধাবিত হবার সময়ে রণদা দেখলেন—তাঁর মন কোনোদিকে এক ইঞ্চিও অগ্রসর হতে চাইছে না, ক্রমাগত ঘুরপাক খেয়ে-খেয়ে মরছে ঐ এক-গাছি চুলকে কেন্দ্র ক'রে। খোকার চিঠি এমন নাটকীয়-ভাবে আঘাত হেনেও রণদার মনের সে চক্র-গতিকে বিশেষ বিক্ষিপ্ত করতে পারেনি।

এর মানে কি? জমিদার-বাড়ীতে যে ক'টি নারী বা পুরুষ আছেন, সবাইকে দেখেছেন রণদা। সবাইয়ের সঙ্গেই আলোচনা করেছেন এই দারুণ দুর্ঘটনার সম্পর্কে। কিন্তু জমিদার-গৃহিণী ছাড়া, এমন একটি নারীও নেই ওখানে, যাঁকে ঐ বিশেষ চুলগাছির মালিক ব'লে সন্দেহ করা যেতে পারে। অত লম্বা, অমন ঢেউখেলানো, অমন গন্ধ-ভুরভুরে চুল আর কারও নয়। অথচ জমিদার-গৃহিণী খোকার বিছানার কাছে একবারও যাননি।...তবে? মশারির গায়ে কোথা থেকে এলো ঐ চুল?

রণদার মনে হলো, এ-সমস্যার উত্তর বার করতে পারলে, তিনি অন্তত এক ধাপ অগ্রসর হতে পারবেন এই দুঃসাহসিক অনুসন্ধানের অভিযানে।

ট্যাক্সি এসে বাজারের সুমুখে দাঁড়ালো। রণদা নামলেন। দু'-একটা জিনিসের দরকার আছে তাঁর। বাড়ী এখান থেকে খুবই কাছে। ট্যাক্সি ছেড়ে দিলেন রণদা।

ফুটপাথের উপরেই দোকান সাজিয়ে বসেছে কয়েকটি ফিরিওয়ালা। ঠিক সামনেই এক অতি সপ্রতিভ ছোকরা। তার বোধহয় ধারণা হলো যে, রণদা তারই দোকানের পেন্সিল, নোটবুক কেনবার জন্যে ট্যাক্সি হাঁকিয়ে ছুটে এসেছে হন্তদন্ত হয়ে। মিষ্ট-হাসি হেসে সে বললে—"এই যে দাদা, এ পেন্সিলগুলো দু'আনা ক'রে···পিছনে রবার দেওয়া আছে কি না! রবার না হ'লে যদি চলে, তাহলে এদিকের থেকে নিন, ছ'পয়সায় পাবেন।"

এ-রকম সাদর নিমন্ত্রণ সহসা অগ্রাহ্য করা সোজা নয়। একবার তাকিয়েই দেখতে হলো, ছেলেটার পণ্যবস্তুর পানে। এবং দেখেই—

পেন্সিল নয়, একটা চার পয়সার নোটবুক কিনলে রণদা। কিনে পকেটে ফেললে সেটা। তারপর আবশ্যকীয় জিনিস কেনবার জন্যে একটা ভ্যারাইটি-ষ্টোরে ঢুকে পড়লো সে। চা, জমানো-দুধ এবং আরো-আরো দু-একটা জিনিসের অর্ডার দিয়ে চেপে বসলো একটা চেয়ারে। অদূরেই সেই ছোকরার দোকান। সে তেমনি সপ্রতিভ-ভাবে পেন্সিলের দাম জানাচ্ছে একে, ওকে, তাকে—ফুটপাথে বিচরণশীল প্রত্যেকটি ভদ্র ব্যক্তিকে। "আসুন দাদা, এই যে রবারওলা পেন্সিল দেখছেন,

মাত্র দু-আনায় পাবেন। চমৎকার জিনিস দাদা, আর ষোলো আনা দিশী জিনিস! এমন জিনিস যে আপনার দেশেই তৈরী হচ্ছে আজকাল, তা নিশ্চয়ই খবর পাননি এখনো।"

রণদার পকেটে সেই চার পয়সার নোটবই। মোটা নীল কাগজ, সরু ফালির মতো। একসঙ্গে গেঁথে, তারই উপরে মার্বেল-কাগজের একটা মলাট পরিয়ে দিয়েছে। মোটা নীল কাগজ, ঠিক এমনি আর-একখানা কাগজে খোকা চিঠি লিখেছে তার মা ও বাবাকে।

হয়তো এই ফিরিওয়ালার নোট-বইয়ের সঙ্গে সে-চিঠির কাগজের কোনো সম্বন্ধই নেই। কিন্তু ঠিক একই কাগজ এবং একই সাইজে কাটা! এই রকমই আর-একখানা নোটবই থেকে যে ঐ চিঠির কাগজ সংগ্রহ করা হয়েছিল, এতে তিলমাত্র সন্দেহ নেই।

জিনিসগুলো এদিকে প্যাক করা হয়ে গিয়েছে। দাম মিটিয়ে দিয়ে রণদা দোকান থেকে বেরিয়ে এলো। ছোকরাটির সুমুখে দাঁড়িয়ে বললে—"হ্যাঁ ভাই, একটা কথা শুনবে?"

সপ্রতিভ ছোকরা অমনি উঠে দাঁড়িয়ে এক-গাল হেসে বললে—"বলুন না!"

—"এই যে নোট-বইয়ের কাগজ, এ তোমাদের দরকার আছে? আমার এক বন্ধুর ছাপাখানায় ঠিক এইরকম কাগজ, এই সাইজ···ছাঁট আর-কি···বহু প'ড়ে আছে। তোমাদের কারখানায় যদি দরকার থাকে তো দেখ।"

ছোকরা ঠোঁট ফুলিয়ে একটা আপশোষের আওয়াজ করলে। "কারখানা কোথায় বাবু? আমি নিজেই তৈরী করি, নিজেই বেচি। ছাঁটই কিনেছিলাম বটে এক ছাপাখানা থেকে, তা ও নোটবই বিক্রি বড় কম। দেখুন না! পরশু এক-ডজন খাতা তৈরী করেছিলাম, কাল এক ঠাকুর কিনে নিয়ে গেলেন একখানা, আজ এই বেলা প্রায় এগারোটা এখন, সবে মাত্র একখানি বেচেছি আপনার কাছে। পেন্সিলটাই কাটে দাদা, ওতেই যা দু-পয়সা থাকে।"

পেন্সিলের বাণিজ্য সম্বন্ধে কোনো কৌতূহলই ছিল না রণদার। সে জানতে চায়, খাতার ব্যাপার। খুব অতিরিক্ত কৌতুকের ভাণ ক'রে সে বললে—"বলো কি? ঠাকুর কিনলেন, নোট-বই? চাল-কলার সঙ্গে নোট-বই গামছায় বেঁধে নিয়ে গেলেন বুঝি?"

ছেলেটিও হেসে উঠলো। তারপর বললে—"না, না, চাল-কলা-গামছার ঠাকুর নয়, দাদা! দেখলে ভয় ভক্তি দুটোই হয়। ইয়া রক্ত-চন্দনের তিপুণ্ড্র আঁকা কপালে! টক্‌টকে ফর্সা রং, কালো কুচ্‌কুচে দাড়ি, সাদা ধপ্‌ধপে পৈতে! ঠাকুরের মত ঠাকুর, দাদা!"

আরও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে রণদা, এমন সময়ে একটি বালক এসে পেন্সিলের দাম জিজ্ঞাসা করলে। দোকানী অমনি ষোলো-আনা মনোযোগ সঁপে দিলে খরিদ্দারের দিকে, রণদার দিকে ফিরেও

চাইলে না আর! রণদাকে বাড়ীর দিকেই পা চালাতে হলো অগত্যা!

ঠাকুর? রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্র? অর্থাৎ, শাক্ত? হয়তো মা-কালীর ভক্ত! এবং—এবং খোকার চিঠিতে লেখা আছে—"মা কালী তোমাদের শাস্তি দেবেন!" কোথায় যেন একটা যোগাযোগের ছায়া দেখা যায় না?

খোকা—দশ বৎসরের বালক। রাজার ছেলে! সংসার-যাত্রার স্রোত যে-খাত বেয়ে চলে ও-বাড়ীতে, তাতে সাহেবীয়ানার প্রকোপ বারো-আনার বেশী, হিন্দুয়ানীর চার-আনারও কম। এহেন স্থানের ছেলে রাতারাতি কালীভক্ত ব'নে গিয়ে থাকে যদি, সে একটা ইন্দ্রজাল ছাড়া কিছু নয়!

মহৎ কাজে আত্মোৎসর্গ? এর কোনো কথাই খোকার নিজস্ব নয়! পত্র যে লিখিয়েছে, তারই মনের ভাব প্রতিফলিত হয়েছে ঐ তিন লাইনের নীল-কাগজের চিঠিতে! সে কি ঐ—ঠাকুর? যার গায়ের রং টক্‌টকে ফর্সা এবং দাড়ির রং কুচ্‌কুচে কালো?···যার সাদা পৈতে গলায় এবং লাল ত্রিপুণ্ড্র কপালে?···

মহৎ কাজের প্রয়োজনে ঠাকুরমশাই কি একা খোকারাজাকেই চুরি করেছেন, না, ইতিপূর্ব্বে কলকাতা-সহরে যে প্রায় অর্দ্ধ-শত মানুষ হঠাৎ গুম্ হয়ে গেছে, তাদের সবাইকেই সরিয়ে ফেলেছেন—আত্মোৎসর্গের সুযোগ দেবার জন্যে? এই ঠাকুরটিকে পাওয়া যায় কোথায়?

রণদা বাড়ী পৌঁছে গেল।

সদর-দরজায় কড়া নেড়ে কোনো জবাবই পেলে না রণদা। এ আবার কী? রামচরণ তো বাড়ীতেই আছে। তা নইলে তো বাইরে তালা ঝুলতো! আবার কড়ার উপর অত্যাচার সুরু করলে রণদা! নাঃ! কোনো সাড়া নেই রামচরণের! ঘুমোলো নাকি এই অবেলায়? ঘুমোলেই-বা কত গভীর হতে পারে সে ঘুম? এত সোরহাঙ্গামাতেও চৈতন্য হবেনা তার?

নাঃ! একটা কিছু ঘটেছে ভিতরে! বাড়ীতে একা লোক রামচরণ, হয়তো সিঁড়ি থেকে প'ড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে! নয়তো, হ্যাঁ, এমনও হতে পারে যে—অর্থাৎ, রণদা গোয়েন্দা লোক, তার শত্রু আছে অনেক, তারা একটা অঘটন ঘটাবে বাড়ীতে এসে, এমনটাও অসম্ভব নয়!

সদর দরজা ভাঙবে কি না ভাবছে রণদা, এমন সময়ে পাশের বাড়ীর বনমালী মাষ্টার বেরিয়ে এলেন। বৃদ্ধ লোক, সারাদিন বাড়ীতেই থাকেন। তিনি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি! রণদার মুখে বৃত্তান্ত শুনে বললেন—"তাইতো! একটা কিছু ঘটেছে হয়তো! সদর আর ভাঙবেন না। আমার বাড়ীর ভিতর দিয়ে চলে আসুন। দুই ব্লকের মাঝখানে যে দরজা, ভাঙতে হয়তো, সেইটেই ভাঙা যাক! মেরামত হতে দু'দিন দেরী হলেও কিছু এসে যাবে না।"

সদ্‌যুক্তি। বনমালীবাবুর বাড়ীর ভিতর দিয়েই রণদা ঢুকলো নিজের বাড়ীতে। কোথাও রামচরণের দেখা নেই। সব ঘরেরই দরজা খোলা! কিন্তু, এ কেমনধারা ব্যাপার? রণদা নিজের শোবার ঘরে ঢুকলো।

যাঃ! ঐ যে রামচরণ!

সটান প'ড়ে আছে মেজেতে! তার হাতে একটা রক্তজবা!

রক্তজবা? রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্রধারী অজ্ঞাত ঠাকুর-মশাইয়ের কথা মনে প'ড়ে গেল রণদার! এবং, খোকার চিঠিতে মা-কালীর নাম উল্লেখ! জবা তো, মা-কালীর পূজোতেই লাগে!

বনমালী মাষ্টার রণদার সঙ্গেই এ-বাড়ীতে এসেছিলেন। তিনি রামচরণের বুকে হাত দিলেন চট ক'রে। অর্থাৎ ওখানে স্পন্দন আছে কিনা, দেখতে চান! বুকে হাত দিয়েই তড়িতাহতের মত ছিটকে পড়লেন তিনি, তিন হাত দূরে! রণদা সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো তাঁর পানে।

—"আমায় যেন কে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে, রণদাবাবু!" ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললেন বৃদ্ধ। তাঁর চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে গেছে একটা অনির্দ্দেশ্য আতঙ্কে, ঘন-ঘন শ্বাস বইছে তাঁর! তিনি নিজের অজ্ঞাতসারেই পিছনপানে হটতে লাগলেন পায়ে-পায়ে!

রণদারও কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিলো। কিন্তু রামচরণটা

বেঁচে আছে কিনা বোঝা তো দরকার! সে রামচরণের নাকের কাছে হাত নিয়ে গেল। স্পর্শ-বাঁচিয়ে অনুভব করবার চেষ্টা করতে লাগলো—নিশ্বাস বইছে কিনা। নাঃ! বইছে না! মরে গেছে রামচরণটা!

ওর হাতের টক্‌টকে জবাফুল যেন কার রক্তচক্ষুর মতো নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে রণদার পানে। রামচরণের মৃত্যুর সঙ্গে সত্যিই ও ফুলটার কোনো সম্পর্ক আছে নাকি?

কিন্তু, সে-চিন্তা পরে। বনমালীবাবুকে দাঁড়াতে ব'লে টেলিফোন তুলে নিলে রণদা। পর-পর দুটো টেলিফোন করলে, একটা নিকটতম ডাক্তারের কাছে, একটা থানায়।

ঘরের, বা বাড়ীর কোনও জিনিস এদিক-ওদিক হয়নি! খোলা-ড্রয়ারে প্রায় পঁচিশ টাকার মতো পড়েছিল, তাও যথাস্থানেই রয়েছে। লোহার আলমারি যথাপূর্ব্বং বন্ধ। কোনো জিনিস বেরিয়ে যায়নি। তবে বাইরে থেকে ভিতরে এসেছে একটা জিনিস···ঐ জবা ফুল!

ডাক্তারই আগে এলেন। তিনিও বনমালীবাবুর বাড়ীর ভিতর দিয়ে ঢুকলেন। পুলিশ না এলে আর সদর খুলবে না রণদা। দু'কথায় ডাক্তারকে সব বুঝিয়ে দিলে রণদা। বনমালীবাবু রামচরণের দেহ স্পর্শ করা মাত্র তড়িতাহতের মতো দূরে ছিটকে পড়েছেন শুনে ডাক্তার গুম্ হয়ে রইলেন পাঁচ মিনিট। তারপর ঘরের কোণ থেকে রণদার বেতের

লাঠিটা নিয়ে এসে তাই দিয়ে রামচরণের মুষ্টি থেকে জবাফুলটা ছাড়িয়ে আনবার চেষ্টা করতে লাগলেন···রণদার দিকে তাকিয়ে বললেন—"মনে হচ্ছে ঐ ফুলটাই যত নষ্টের গোড়া!"

—"অর্থাৎ, ওতেই ইলেক্‌ট্রিসিটি আছে?"···জিজ্ঞাসা করলে রণদা।

—"অসম্ভব কি?"···ব'লে ডাক্তার ফুলটা টানতে লাগলেন লাঠি দিয়ে।

রণদা বললে—"পুলিশ আসার আগে ফুলটা সরানো···"

ডাক্তার বললেন—"লোকটাকে বাঁচানো সম্ভব কিনা, দেখতে হবে তো! তাছাড়া, ফুল ওর হাতে থাকতে ওকে স্পর্শ করা বিপজ্জনক বলেই মনে করি!"

ফুল ধীরে-ধীরে আলগা হয়ে খুলে এলো রামচরণের হাত থেকে। একটা বেড়াল খাটের নীচে বসেছিল চুপ ক'রে, সে হঠাৎ কি মনে ক'রে ফুলটার উপর থাবা মারলে আর সঙ্গে-সঙ্গেই ছিটকে পড়লো, ডাক্তারবাবুর পায়ের তলায়। তারপর একবার খাবি খাওয়ার মত মুখভঙ্গী ক'রে একেবারে নিস্পন্দ হয়ে গেল সে।

—"এইবার বোধহয় আমরা নির্ভয়ে আপনার চাকরের তদারক করতে পারি।"···ব'লে ডাক্তার অগ্রসর হলেন।

···ক্রিং ক্রিং! টেলিফোন বেজে উঠলো। রণদা ধরলে গিয়ে রিসিভার। "হ্যাল্লো! হ্যাল্লো!"

—"আপনি কি, রণদাবাবু ?"

রণদা একমুহূর্ত্ত কি ভেবে নিলে। তারপর ডাক্তার এবং বনমালীবাবুকে বিস্মিত ক'রে দিয়ে বললে—"না, আমি রণদাবাবু নই। কে আপনি ? কী দরকার রণদাবাবুর কাছে ?"

উত্তর হলো—"দরকারটা রণদাবাবুকেই বলবো। লাইনটা দিন না তাঁকে !"

—"দেবার উপায় নেই মশাই ! রণদাবাবু মারা গেছেন এই আধঘণ্টা হলো !"

টেলিফোনের ওধারে কি-একটা—চাপা-হাসির শব্দ শোনা গেল ?···না রণদার মনের ভুল ?

—"ওঃ ! বড়ই দুঃখের বিষয় তো ! আমার একটা কেস ছিল তাঁকে দেবার মতো !"···লাইনের ওধারের লোকটি টেনে-টেনে বললে কথা-কয়টি, যেন হাসি চাপবার দিকেই তার মনোযোগের অর্দ্ধেকটা নিযুক্ত রয়েছে।

রণদা বললে—"রণদাবাবুর সহকারী আমি। আমার দ্বারা যদি আপনার কাজ উদ্ধার হয় মনে করেন, আমি এসে দেখা করতে পারি।···আপনার ঠিকানা ?"

এবার স্পষ্ট শোনা গেল একটা ব্যঙ্গের হাসি। তারপরই ও-ধার থেকে কথা ভেসে এলো রণদার কানে—"সহকারী দিয়ে কাজ উদ্ধার হবে কিনা আমাদের, সেটা আগে ভেবে দেখি ! উপস্থিত আমাদের ঠিকানা হলো,

হাওড়া-ষ্টেশনের ওয়েটিং-রুম !"...খুট ক'রে একটু শব্দ হলো... লাইন ছেড়ে দিয়েছে লোকটা।

—"হাওড়া ওয়েটিং-রুম ! অর্থাৎ, নিজের বাড়ী থেকেও টেলিফোন করেনি—এক্সচেঞ্জ থেকে পাছে কোনোক্রমে ধরা প'ড়ে যায় ওদের নম্বর !"...বলতে-বলতে ডাক্তারের দিকে ফিরলে রণদা। ডাক্তার ততক্ষণ রামচরণকে ত্যাগ ক'রে একটা চেয়ারে ব'সে পড়েছেন হতাশভাবে। আর-একটা চেয়ারে, বনমালীবাবু।

—"অনেকক্ষণ মারা গেছে, এবং ইলেক্‌ট্রিক্ শকেই মারা গেছে !"...ধীরে-ধীরে বললেন ডাক্তারবাবু।

—"এমন অদ্ভুত, অস্বাভাবিক ঘটনা"...ব'লে সবে কথা সুরু করেছেন বনমালীবাবু, এমন সময় বনমালীবাবুর ছেলে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো থানার ইন্‌স্পেক্টর সুহৃৎ চৌধুরীকে।

—"কী রণদা, ব্যাপার কী ?" প্রশ্ন করেই, রামচরণকে দেখে আঁৎকে উঠলেন সুহৃৎবাবু। রামচরণকে খুবই পছন্দ করতেন ইন্‌স্পেক্টর, আদর্শ চাকর ব'লে।

ইন্‌স্পেক্টরকে নিজের রিপোর্ট জানিয়ে ডাক্তার বিদায় নিলেন। যাবার সময় জবাফুলটার সম্বন্ধে বার-বার সতর্ক ক'রে দিয়ে গেলেন সবাইকে—"ওর ভিতরকার ইলেক্‌ট্রিসিটি আরও কতক্ষণ কতটা পরিমাণে বজায় থাকবে, জানিনা। সুতরাং সাবধান !"

বনমালীবাবুকেও এখনকার মতো বিদায় দিয়ে থানায়

টেলিফোন করলেন সুহৃৎবাবু, এম্বুলেন্স বন্দোবস্ত করার জন্যে। কারণ, রামচরণের দেহ—মর্গে পাঠাতে হবে। তারপর একটা কাঠের কৌটোতে অতি কৌশলে তুলে ফেলা হলো জবাফুলটা। কাঠের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ বেরুবে না, এই আশা।

এবার রণদা বললে—"কী বুঝছো, সুহৃৎ?"

সুহৃৎ বললেন—"চিরকাল তোমার মতকেই আমরা সরকারী-লোকেরা বেদবাক্য ব'লে মেনে নিচ্ছি। কারণ, আমরা পুলিশ মাত্র, তুমি হচ্ছো ক্রিমিনোলজিষ্ট, অপরাধতত্ত্বজ্ঞ। আগে বলো, তুমি কি বুঝছো!"

রণদা একমুহূর্ত্ত রামচরণের দেহের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর সুহৃদের মুখের উপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বললে—"আমি বুঝছি, এবার আমরা এমন-এক শত্রুর সম্মুখীন হয়েছি, যে ছোরা-পিস্তলের চাইতেও সাংঘাতিক অস্ত্র নিয়ে লড়াই করে।"

—"ছোরা-পিস্তলের চাইতে সাংঘাতিক অস্ত্র?" সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন সুহৃৎ।...."কী অস্ত্রের কথা কইছো, রণদা?"

—"মন্ত্রশক্তি। সেই শক্তিতে জবাফুলে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হয় এবং সেই শক্তিতে অভিভূত হয়ে মা তার নিজের হাতে ছেলেকে তুলে দেয় ঘাতকের করে!" রণদার মুখ থেকে যেন তার ঘোর অনিচ্ছাতেই ধীরে-ধীরে নিঃসারিত হলো এই কয়েকটি কথা।

তিন

…আপনা থেকে হাসিমুখে, দৃঢ়পদে এগিয়ে আসছে এক-একটা লোক। নির্দ্দিষ্ট জায়গাটিতে এসে হাঁটু গেড়ে বসছে। তারপর সুমুখের তাজা রক্তমাখা কাষ্ঠখণ্ডটার উপরে স্বেচ্ছায় পেতে দিচ্ছে মাথা। "জয় কালী, জয় কালী, জয় কালী"-রব তাদের মুখে। খাঁড়া উঠছে ও-পাশ থেকে। আঁধার ঘর শুধু হোমাগ্নির কম্পমান-শিখায় ঈষৎ আলোকিত। আলো-আঁধারের সেই অস্পষ্ট আসা-যাওয়ার ভিতরে নিয়মিত ওঠা-নামা করছে সেই রক্তরাঙা নরবলির খাঁড়া। দু-মিনিট পরে-পরে গড়িয়ে পড়ছে এক-একটা সদ্য-ছিন্ন নরমুণ্ড, ঝলকে-ঝলকে রক্ত বেরিয়ে স্রোতের আকারে বয়ে যাচ্ছে একটা পাথরের চৌবাচ্চার পানে! দু'চারবার হাত-পা ছুঁড়ে ধড়গুলো পড়ছে নিশ্চল হয়ে, অমনি যমদূতের মতো বিকট কালো পালোয়ান একটা লোক এসে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে তাদের অদূরের একটা গভীর গর্ত্তে!

এক, দুই, তিন, চার, দশ, পনেরো, কুড়ি, পঁচিশ, ছাব্বিশ, সাতাশ! সাতাশটা নরমুণ্ড জমা হয়েছে প্রতিমার পায়ের কাছে। কালো চুলে রক্তের ঢেউ! বীভৎস নিথর স্থির দৃষ্টি, মুণ্ডগুলির মরা-চোখে! নির্নিমেষে যেন দেখছে তারা বৈতরণীপারের নতুন দেশ!

সাতাশেই শেষ আজ! আগের অমাবস্যায় গেছে জন্যে আজকের অমাবস্যায় আরও সাতাশ!···চুয়ান্ন হলো! একটা চুয়ান্ন চাই! ঠাকুরমশাইয়ের খড়মের শব্দ আঁধারের ভিতর বেজে উঠলো—খট্, খট্, খট্, খট্! কোথা থেকে মন্ত্রপাঠ হচ্ছে গম্ভীর-গলায়! হোমাগ্নি-শিখা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে মাঝে-মাঝে, তাতে মায়ের মুখ দেখা যাচ্ছে চমকের মতো! সে-মুখ ভাবলেশহীন, কঠিন, দুর্বোধ্য!

সাতাশটা মুণ্ড ঝুড়িতে তুলে নিয়ে গেল যমদূতের মতো কালো লোকটা। মাথায় ক'রে চললো সেই ঝুড়ি। ঝুড়ি থেকে রক্তের মোটা ধারা নামতে লাগলো লোকটার মাথা ও গা বেয়ে। দু'চার ফোঁটা তার ঠোঁটেও লাগলো। ওতে তার বিতৃষ্ণা নেই! নররক্তের স্বাদ ওর ভালোই লাগে!

নিরুদ্বেগ গুরুগম্ভীর চালে চলেছে ও ওই আঁধার-পথে। ঠাকুর প্রতীক্ষায় রয়েছেন। তা থাকুন! অমাবস্যা এখনও অনেকক্ষণ রয়েছে। অবশ্য, কাজও বাকী ঢের।···মাথাগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে, ওপরকার চামড়া ছাড়িয়ে দিতে হবে, তবে ঠাকুরমশাইয়ের কাজ সুরু হবে!

খড়মের শব্দ শোনা যায়—খট্, খট্, খট্, খট্! ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন বোধ হচ্ছে। ভৈরব এবারে পা চালিয়ে দিলে। ঠাকুর এক-এক সময়ে রেগে যান। সে-সময়ে ভয়ানক ভয় করে ভৈরবের। মরার ভয় নয়! মরতে ভয়

করবে—এমন বোকা ছেলে ভৈরব নয়। কিন্তু ঠাকুর যখন রেগে তাকান, তখন ভৈরবের দেহের ভিতরটা যেন জ্বলতে থাকে দাউ-দাউ ক'রে। অসহ্য সে জ্বলুনি! সেইজন্যেই ঠাকুরকে রাগাতে চায়না ভৈরব।

আগাগোড়া কালো মার্বেল পাথরে তৈরী একখানা ঘর। তার চারদিকের দেয়ালের গায়ে সারি-সারি চওড়া কাঠের তাক, তাতে তিলধারণের স্থান নেই। হরেক-রকমের শিশি-বোতল, কাচের জার, কাঠের কৌটোতে বিলকুল ভর্ত্তি। এক কোণে একটা ছোট টেবিলে দু'চারখানা বই, খাতা ও লেখার সরঞ্জাম। ঘরের মাঝখানটা জুড়ে লম্বা একখানা কালো পাথরের প্রকাণ্ড টেবিল।

কোণের ছোট টেবিলে ব'সে আছেন এক দীর্ঘদেহ ব্রাহ্মণ। টক্‌টকে ফর্সা তাঁর গায়ের রং, কুচ্‌কুচে কালো তাঁর অনতিদীর্ঘ চাপ-দাড়ি, ধব্‌ধবে সাদা তাঁর লম্বা পৈতে। পরনে লাল চেলি, পায়ে হাতির দাঁতের খড়ম। নীল কাগজের ছোট্ট একটি নোট-বুকে তিনি কী যেন লিখছিলেন।

ঝুড়িভরা নরমুণ্ড এনে মাঝের টেবিলের উপরে সারি-সারি সাজিয়ে রাখলে—যমদূতের মতো যার চেহারা সেই ভৈরব-কাপালিক। এখন আর রক্তে নোংরা নয় এগুলো। ভালো ক'রে চামড়া ছাড়িয়ে, বেশ পরিচ্ছন্ন জিনিস এনে হাজির করা হয়েছে ঠাকুরের সুমুখে।

মাথাগুলো সাজিয়ে রেখে ভৈরব চলে গেল। ঠাকুর

উঠলেন এইবার। চেলির উপর বেড় দিয়ে পরলেন একটা মোটা গামছা। তাক থেকে পাড়লেন ছোট্ট হাতুড়ি, বাটালি এবং ধারালো বাঁকামুখো ছুরি। একটা মুণ্ডু সুমুখে টেনে এনে বিশেষ একটা স্থানে বাটালি বসিয়ে দিলেন। হাতুড়ির দু'চারটে ঘা খেয়েই মাথার খুলি দু'ফাঁক হয়ে গেল সেইখানে। চাড় দিয়ে গোটা মাথাটাই দুই খণ্ড ক'রে ফেললেন ঠাকুর। তারপর ছুরি দিয়ে কুরে-কুরে মাথার ঘিলুটা তুলে নিলেন একটা কাচের নলে।

একটা-একটা ক'রে মাথার উপরে এইভাবে অস্ত্রোপচার চলতে লাগলো ঠাকুরের। ঘিলুটা বার ক'রে তুলে নেন কাচের নলে, আর মাথার হাড়গুলো ফেলে দেন ঝুড়ির ভিতর। ক্রমে-ক্রমে সাতাশটা মাথার উপরই কাজ শেষ হয়ে গেল। ভৈরব বোধহয় বাইরেই অপেক্ষা করছিল, সে এসে মাথায় ঝুড়ি তুলে নিয়ে চলে গেল আবার।

কাচের নলটা যথেষ্ট লম্বা। সাতাশটা মাথার ঘিলুতেও ভ'রে ওঠেনি ওটা। তাকের উপর থেকে লম্বা একটা লোহার যন্ত্র পেড়ে নিলেন ঠাকুর। তার মাথাটা বাঁকানো, হুকের মতো। তাইতে ঝুলিয়ে দিলেন কাচের নল। টেবিল থেকে অনেকটা উপরে ঝুলতে লাগলো ওটা। ওর তলায় জ্বালিয়ে দিলেন স্পিরিট-ল্যাম্প।

একটা কাচের জার তাক থেকে পেড়ে নিয়ে এলেন ঠাকুর। তাতে একটা লালচে তৈলাক্ত পদার্থ। তাই

থেকে মাঝে-মাঝে খানিকটা ক'রে ঢালতে লাগলেন ঐ নলের ভিতরে।

এক ঘণ্টার উপর চললো এই প্রক্রিয়া। নলের ভিতর সমস্ত পদার্থটা এখন একটা থক্‌থকে আঠায় পরিণত হয়েছে, রং তার ঈষৎ সোনালী। এইবার নলটা আরেকটা হুকে ঝুলিয়ে দিয়ে, স্পিরিট-ল্যাম্পের তেজ আর-একটুখানি কমিয়ে দিয়ে, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ঠাকুর গিয়ে বসলেন টুলের উপর।

কিন্তু বিশ্রাম তাঁর ভাগ্যে নেই। কোথায় যেন টিং-টিং ক'রে একটা ঘণ্টার ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। অমনি বেরিয়ে পড়লেন তিনি, কোমরের তোয়ালে-খানা খুলে রেখে। লাল চেলির উপর সাদা পৈতের প্রান্ত ব্রহ্মণ্যতেজের মূর্ত্ত বিকাশের মতো দেদীপ্যমান হয়ে উঠলো।

পর-পর দু-খানা ঘর পার হয়ে এলেন ঠাকুর। তারপরই সিঁড়ি। সে-সিঁড়ি সোজা উপরে উঠে গেছে। ঠাকুরমশাই উঠতে লাগলেন তাই বেয়ে। প্রায় ত্রিশটা ধাপ উঠবার পরে ডানদিকে একটা ঘর দেখা গেল। সিঁড়ির কিন্তু শেষ হয়নি তখনো। ঘুরতে-ঘুরতে সোজা উপরে উঠে গেছে, কোথায় তা কে জানে!

ডাইনের ঘরে ঢুকেই দেখতে পেলেন—সোফার উপরে একটি লোক প'ড়ে আছে, ভদ্রলোকের মতো বেশ, কিন্তু হাতে-পায়ে শক্ত দড়ির বাঁধন। উপরন্তু লোকটি বোধহয়

অজ্ঞান হয়ে আছে, তার চক্ষু মুদিত, নিশ্বাস বইছে অতি ধীরে। ঠাকুর গিয়ে তার পাশে দাঁড়ালেন, স্থির লক্ষ্যে তাকিয়ে রইলেন তার মুখের দিকে···ঈষৎ হাসি ফুটে উঠলো ঠাকুরের মুখে।

কিন্তু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করা সম্ভব নয় ঠাকুরের পক্ষে। অনেক কাজ তাঁর···সর্ব্বদাই অনেক কাজ! উপস্থিত তো পনেরো মিনিটের ভিতর নীচের লেবরেটরিতে তাঁকে ফিরতেই হবে। কাচের নলে আরক ঢালবার প্রয়োজন হবে আবার। ঢালতে দেরী হ'লে তো গোটা জিনিসটাই মাটি!

হতজ্ঞান অভাগ্য লোকটির কপালে হাত দিয়ে ঈষৎ একটু নাড়া দিলেন ঠাকুর—"ওঠো, ওঠো রণদা"···ব'লে ডাক দিলেন একবার।

রণদা?

হ্যাঁ, রণদাই বটে। ঠাকুরের এই বন্দী, আমাদের কলকাতা শহরের প্রখ্যাত বে-সরকারী ডিটেকটিভ—রণদা মল্লিকই বটে!

ঠাকুরের হাতের স্পর্শ পেয়েই সচেতন হয়ে উঠেছে অজ্ঞান রণদা। ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে চাইতে লাগলো সে চারদিকে। উঠে বসবার চেষ্টা করতে লাগলো তারপর। কিন্তু হাতে-পায়ে শক্ত বাঁধন, উপায় নেই উঠবার। ঠাকুর তার অসুবিধা বুঝতে পারলেন। চট ক'রে হাতে তালি

দিলেন একবার। অমনি গেরুয়া ত্রিপুণ্ড্রধারী এক গৌরবর্ণ যুবা কোথা থেকে এসে ঢুকলো সেই ঘরে। রণদার বন্ধনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে তাকে দেখিয়ে দিলেন ঠাকুর। আদেশ করলেন—"খুলে দাও বাঁধন!"

এক মিনিট বাদে খোলা-হাত-পায়ে রণদা উঠে বসলো সোফার উপরে। এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে তার সুমুখে দণ্ডায়মান লোকটি কে! এই সেই ঠাকুরমশাই—পেন্সিল-বিক্রেতা ছোকরা যাকে বর্ণনা করেছিল—টক্‌টকে ফর্সা রং, কুচ্‌কুচে কালো দাড়ি এবং ধব্‌ধবে সাদা পৈতের মালিক ব'লে। যদি রণদার গোয়েন্দা-বুদ্ধি ভুল না ক'রে থাকে, তবে এই সেই নাটের গুরু, যাঁর দ্বারা শহরের অর্দ্ধশতাধিক লোক গুম্ হয়েছে—বাঁশজুড়ির দশবছর বয়স্ক খোকা-রাজা সমেত। এই সেই অকুতোভয় কৌশলী-দুর্জন, যার লাল-জবারূপী মারণাস্ত্র, রণদার ভৃত্য রামচরণকে যমালয়ে পাঠিয়েছে আজই প্রাতে!

রণদা এই ঋষিকল্প-আকৃতির নরঘাতককে সম্বোধন করবার যোগ্য ভাষা সহসা খুঁজে পেলে না। কিন্তু ঠাকুরের সময় মূল্যবান। তিনি রণদাকে আর সময় দিতে রাজী নন। কাজেই তাঁকে আলাপ সুরু করতে হলো। তিনি বললেন—"অভাগা তোমার ঐ চাকরটি! ওকে হত্যা করা আমার প্রয়োজনও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। দৈবাৎই মরেছে লোকটা!"

এইবার খুলে গেল রণদার মুখ। তীক্ষ্ণস্বরে বললে সে—"আপনার প্রয়োজন ও ইচ্ছা ছিল বোধহয় আমায় হত্যা করা?"

মৃদু-হাসির ঝিলিক দেখা দিলে ঠাকুরের কালো-দাড়ির ফাঁকে। তিনি শান্তস্বরেই বললেন—"তাতেও কি সন্দেহ আছে তোমার? জবা রেখে এসেছিলাম তোমার শয়নকক্ষে, ঘড়ির নীচে। নিতান্ত কালপ্রেরিত না হ'লে ব্যাটা চাকর দুপুরবেলায় ওখানে গিয়ে ও-ফুল নাড়তে যাবে কেন?"

—"আপনি কেমন ক'রে ঢুকলেন ওখানে?"···জিজ্ঞাসা করলে রণদা।

—"কেন? তোমার চাকরই আমায় দরজা খুলে দিয়েছিল! সেই তো আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তোমার ঘরে। অবশ্য, পরে আর তার কোনো-কথাই মনে ছিল না! আর সে মরে না গেলেও, তার মুখ থেকে আমার সম্বন্ধে কোনো কথাই জানতে পেতে না তুমি!"

ধাঁ ক'রে একটা কথা মনে প'ড়ে গেল রণদার এবং স্থান-কাল-পাত্র সে-প্রশ্নের কতটা অনুকূল, তা চিন্তা করবার জন্য একমুহূর্ত্তও অপেক্ষা না ক'রে সে জিজ্ঞাসা করলে—"আচ্ছা, বাঁশজুড়ির রাণীও কি স্বেচ্ছায় আপনাকে খোকার শোবার ঘরের দরজা খুলে দিয়েছিলেন, এবং—এবং···"

—"এবং ঘুমন্ত ছেলেটাকে স্বেচ্ছায় তুলে দিয়েছিলেন আমার হাতে? হ্যাঁ, দিয়েছিলেন। কেন দেবেন না? মা যাকে চেয়েছেন, কোনো পার্থিব মায়ের তো আর অধিকার

থাকতে পারে না তাকে ধ'রে রাখবার! অবশ্য, অতখানি জ্ঞানোদ্রেক সংসারী-রমণীর মনে হঠাৎ হবে ব'লে আশা করতে পারিনি আমি। এবং সেইজন্যেই তাকে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে কাজটা সহজ আর সংক্ষেপ ক'রে এনেছিলাম।"

—"যা ভেবেছিলাম!"···তিক্তস্বরে ব'লে উঠলো রণদা, "মশারীর গায়ে রাণীর চুল দেখেই ব্যাপারটা ধ'রে ফেলেছিলাম আমি!"

—"আমি জানি তুমি ঐরকমই ভেবেছিলে···ঐভাবেই প্রকৃত ব্যাপারটা ধ'রে ফেলেছিলে। তোমার বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে তখন একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম আমি। তাইতে লাল-জবা রেখে আসতে হয়েছিল তোমার ঘরে। কিন্তু তাতেও তুমি টিকে গেলে! ফলে, আরও চিন্তায় প'ড়ে গেলাম আমি। তাই তোমায় এখানে আনিয়েছি একটা রফা নিষ্পত্তি করবার জন্যে।"···এক নিশ্বাসে এতগুলো কথা ব'লে তবে ঠাকুর নীরব হলেন।

—"রফা?" বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে রণদা। নর-ঘাতকের সঙ্গে রফা কি ক'রে হতে পারে, এটা সে বুঝতে পারলে না। নরঘাতক! রামচরণের হত্যার জন্যে অন্তত দায়ী ঐ ভণ্ড তপস্বী। অন্য যে-সব লোক গুম্ হয়েছে ওর দ্বারা, তাদের পরিণাম সম্বন্ধে এখনও অজ্ঞ রণদা, কিন্তু রামচরণকে তো সে নিজের চোখে দেখে এসেছে—জবা-হাতে মেঝেয় লুটিয়ে থাকতে!

—"হ্যাঁ, রফা।" দৃঢ়-স্বরে উত্তর দিলেন ঠাকুর।···"এ নিয়ে তুমি গর্ব্ব বোধ করতে পারো, রণদা মল্লিক। যে-লোক দু'শো বছরের ভিতর দেবতা বা মানুষ বা পিশাচ কারো সঙ্গে কোনো রফা করেনি···"

বাধা দিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলো রণদা—"দু'শো বছর ?"

—"আমার বয়স দু'শো বছরের কিছু বেশীই হবে, বাবা। পলাশীর মাঠে নিজের হাতে পাঁচটা গোরার শিরশ্ছেদ করেছিলাম আমি।"···একটু গর্বিত স্বরেই যেন এ-কথা বললেন ঠাকুর।

—"তখন বুঝি লাল জবা-টবা রপ্ত হয়নি আপনার ?"··· রণদার কথার ভিতর একটু কি ব্যঙ্গের আভাস ফুটে উঠলো ?

—"অবিশ্বাসী! এবং দুর্বিনীত! শতাব্দীর একাগ্র সাধনায় যে শক্তি আয়ত্ত করেছি আমি, তা হলো তোমার পরিহাসের বস্তু ?"

এ-কথার উত্তর সহসা যোগালো না রণদার মুখে। হোক এ-লোকটা নরঘাতক, কিন্তু একে সম্ভ্রম না ক'রে যেন উপায় নেই কারো। এ এক ঘোর প্রহেলিকা! রণদা এটাও লক্ষ্য করছিল—ঠাকুর তাকে অবলীলাক্রমে 'তুমি' ব'লে যাচ্ছেন, কিন্তু রণদা একাধিকবার বিশেষ চেষ্টা করেও 'আপনি' ছাড়া কিছু বলতে পারেনি তাঁকে। জিভে যেন সম্ভ্রম-সূচক সম্বোধন আপনা থেকেই বেরিয়ে আসে।

যাতে রণদাকে নীরব দেখে ঠাকুর নিজেই কথা কইলেন আবার।

"অবশ্য, কু-শিক্ষা অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষাই তোমার ঔদ্ধত্যের জন্যে দায়ী। সেজন্যে আমি তোমায় খুব বেশী দোষী করবো না। এবং সে-কথা নিয়ে আলোচনা করবারও সময় নেই আমার। আমি তোমায় আনিয়েছি একটা রফা করবার জন্যে। কারণ, তোমার মৃত্যু বোধহয় মায়ের অভিপ্রেত নয়। তাঁর ইচ্ছা থাকলে, লাল-জবার দৌত্য কখনো ব্যর্থ হতো না।"

—"আপনার লাল-জবা শুধু নয়, অনেকের পিস্তল, এ্যাসিড এবং বোমার দৌত্যও ব্যর্থ হয়েছে রণদা মল্লিকের পাল্লার ভিতর এসে।"···একটু হেসেই রণদা উত্তর দিলে।

—"কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা করছো, বালক? লাল-জবার সঙ্গে—পিস্তল? কিন্তু যাক্ সে-কথা। আমি তোমায় হত্যা করতে চাই না। চাইলে তো এখানে, এই মুহূর্ত্তেই শেষ ক'রে দিতে পারি তোমায়। কেমন? পারি না?"··· প্রশ্ন ক'রে রণদার মুখের দিকে তাকালেন ঠাকুর।

রণদাকে স্তব্ধই থাকতে হলো। নিরস্ত্র সে। এই নিভৃত অজ্ঞাত আড্ডায় তাকে শেষ ক'রে দেওয়া এই বে-পরোয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে যে খুবই সোজা···তা নিয়ে তো তর্কই চলে না।

—"হ্যাঁ, যা বলছিলাম। রফা করো। তুমি আর এ-ব্যাপারের ভিতর থেকো না। সরকারী-পুলিশকে মোটেই গ্রাহ্য করি না। কিন্তু তোমায় নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছি আমি। তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্যে নয়; শুধু মা তোমায় এই মুহূর্ত্তে কোলে টানতে চান না, দেখে।" একটু হেসে আবার বললেন ঠাকুর—"বেটীর

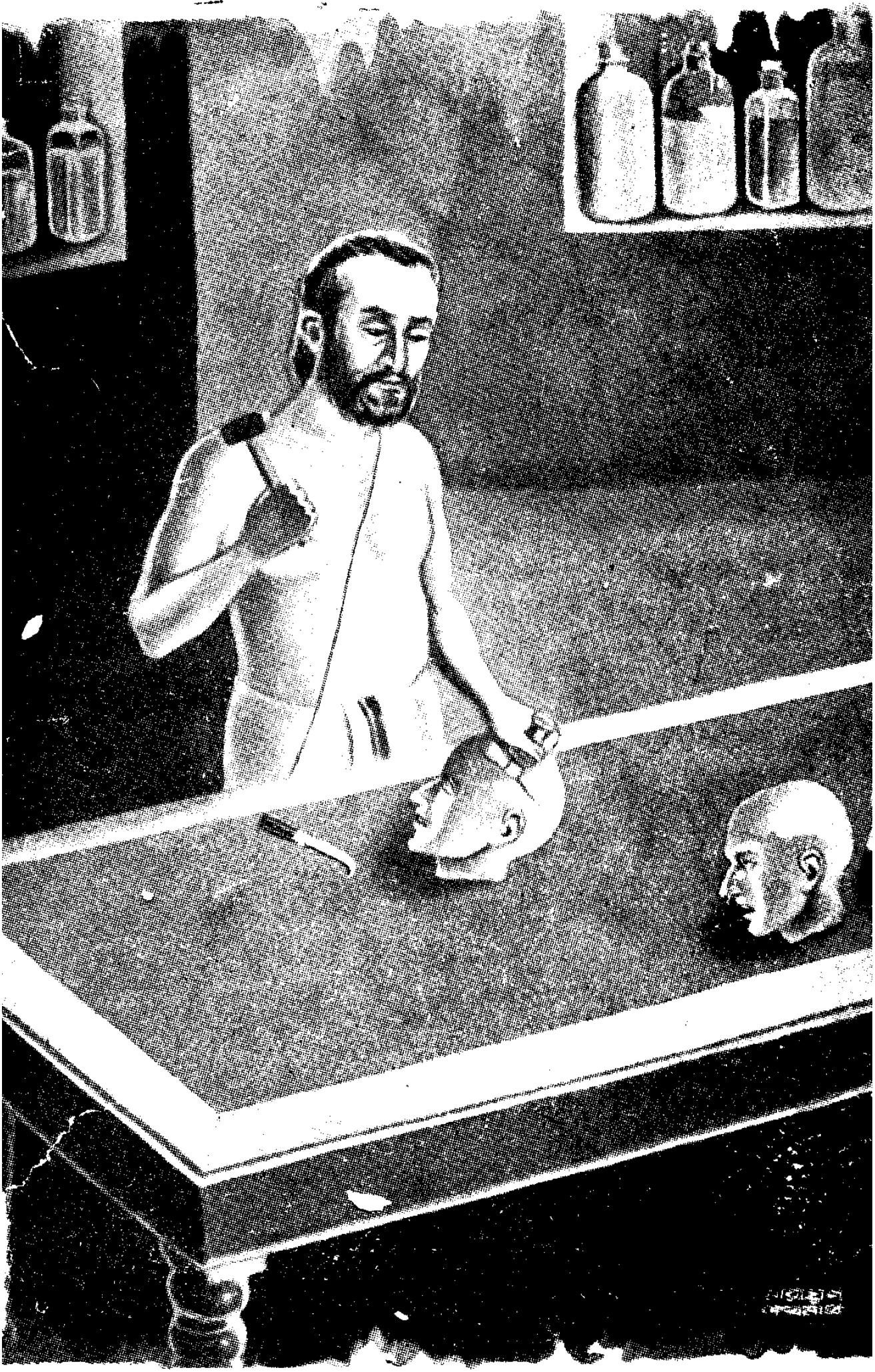

—মুণ্ডুটা সুমুখে টেনে এনে বাটালি বসিয়ে দিলেন—

আবার রুচি-অরুচির ঝামেলা, সাংঘাতিক কিনা! একশো-আটটি নরবলি দিতে হবে তাঁকে···কিন্তু তার মধ্যে তাঁর অপছন্দ লোক একটিও নেবেন না তিনি।"

হাসতে-হাসতে যে-কথাটি নিতান্ত বাজে-কথার মতই রণদার মুখের উপর ছুঁড়ে মারলেন ঠাকুর, তা যেন বজ্রাঘাতের মতই নিথর নিস্পন্দ ক'রে ফেললে রণদাকে, এক নিমেষের ভিতর। একশো-আটটা নরবলি? একশো-আট নরবলি দিতে হবে যাঁকে, তাঁকে আবার 'মা' বলা যায় কোন্ হিসাবে, তা তো রণদার বুদ্ধির অগম্য।

ঠাকুর কিন্তু নিজের কথাই ব'লে চলেছেন। "হ্যাঁ, রফা করো। তুমি প্রাণ নিয়ে পালাও···আমি নিজের কাজ করি। বাঁশজুড়ির কুমারের কথা স্রেফ ভুলে যাও, এবং আগামী মাস-দুই-তিনের ভিতর অন্য কোনো মানুষ-চুরির মামলা হাতে নিও না তুমি। হ্যাঁ, মাত্র দু-তিন মাস! এর ভিতরই আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে আশা করি।"

—"কাজ শেষ? অর্থাৎ, একশো আট?···" কথা শেষ হলো না রণদার মুখে। ঠাকুর হেসে ফেললেন তার হতভম্ব অবস্থা দেখে।

—"একশো আট নরবলির কথা বলছো? সে তো যাবেই শেষ হয়ে। কিন্তু সেটা শেষ হলেই তো আর কাজ শেষ হয়ে গেল না। বলির পরে আমার আসল কাজটা তো সবে সুরু হবে। ধরো—নরমুণ্ড থেকে মস্তিষ্কবস্তু নিষ্কাশিত ক'রে

নিয়ে, তা দিয়ে করতে হবে অমৃত তৈরী···সেই অমৃত যেদিন সত্য-সত্য তৈরী হবে···পৃথিবীতে আর জরা বা মৃত্যু থাকবে না···দুঃখ-দৈন্য সব যাবে বিলুপ্ত হয়ে···ধূলির ধরণীতে নেমে আসবে, মুনি-ঋষিদের স্বপ্নের বস্তু সর্ব্ব-সুখৈশ্বর্য্যময় স্বর্গপুরী···"

বলতে-বলতে একটা দিব্য আভায় মণ্ডিত হয়ে উঠলো ঠাকুরের মুখ।

রণদা ভেবে পায়না—এ-লোকটাকে বাতুলের পর্য্যায়ে ফেলবে, না দেবতার দলে। দুশো বছর আগে জন্ম, একশো আট নরবলি, অমৃত আবিষ্কার—এ-সব কি কথা? লোকটা সাধক সন্দেহ নেই, এর শক্তির পরিচয় অনেকই পাওয়া গেছে, কিন্তু সাধনা করতে-করতে অনেক লোক পাগল হয়ে যায়, এবং তখন সে-সব পাগল নিয়ে বিপর্য্যয় কাণ্ড বাধে সমাজে, এ-কথাও শুনেছে রণদা।

ঠাকুর বোধহয় তার মনের সন্দেহ অনুমান ক'রে নিলেন। তিনি আরও কি-যেন বলতে যাচ্ছিলেন তাকে, কিন্তু হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়লো, ঘড়ির উপরে। দেয়ালে একটা প্রকাণ্ড ঘড়ি রয়েছে এক নৃত্যশীলা ডাকিনী-মূর্ত্তির মাথার উপরে। ঠাকুরের দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে রণদা ঐ পাথরের ডাকিনী দেখে অবাক হয়ে গেল। ঘড়ির সঙ্গে—ডাকিনী! পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে প্রাচ্যের অন্ধতম কুসংস্কার কি নতুন ক'রে অভিযান সুরু করলে পৃথিবী ছেয়ে ফেলবার জন্যে? ঠাকুরের কথা এবং

কাজ—দুই-ই তো সেই কিম্ভূতকিমাকার সমন্বয়ের দিকে ইঙ্গিত করছে!

ঠাকুর চঞ্চল হয়ে উঠলেন। রণদাকে বললেন—"আমার জরুরী কাজ রয়েছে, এক সেকেণ্ডও আর দেরী করা চলবে না। তুমি বসো, এখনো আমার কথা শেষ হয়নি। অথবা—হ্যাঁ, ইচ্ছে করলে আমার লেবরেটরী দেখতে পারো এসে।"

তীব্র কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে ত্বরিতপদে রণদা বেরিয়ে এলো ঠাকুরের পিছনে-পিছনে। অমৃত তৈরীর কারখানাটা অন্তত দেখে আসা যাক। কিন্তু একটা গভীর বিস্ময়ও থেকে-থেকে মাথা তুলছিল তার মনের অন্দরমহলে। এই নরঘাতক নিজের নিভৃত পাপপুরীর অন্ধি-সন্ধি তাকে কোন্ সাহসে দেখাতে চায়?

অমৃত পাছে পুড়ে যায়, এই আশঙ্কায় ঠাকুর তখন নেমে চলেছেন, এক-এক লাফে তিন-তিনটে সিঁড়ি অতিক্রম ক'রে। রণদা ঠিক তাঁর পিছনে আসছে কিনা, সেদিকে আর লক্ষ্য নেই তাঁর। রণদা পিছনে এবং ডাইনে-বাঁয়ে তাকিয়ে দেখলে—না···কোথাও কোনো প্রহরী চোখে পড়ে না। লেবরেটরী দেখতে যাবে, না এই সুযোগে চেষ্টা ক'রে দেখবে একবার যে, পালানো যায় কি না?

সিঁড়ির মোড়ে এসেই ঠাকুর অদৃশ্য। রণদা নীচে নামলো না আর। ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটে চললো উপরদিকে···তীরবেগে···

নিঃশব্দে! প্রতি মুহূর্ত্তে আশঙ্কা—এই বুঝি ঠাকুরের কোনো সাগরেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায়।

যে-ঘরে এতক্ষণ কথা হচ্ছিলো ঠাকুরের সঙ্গে, সে ঐ প'ড়ে রইলো ডাইনে। রণদা সোজা উপরে উঠতে লাগলো···আরও উপরে! সারা বাড়ীটা একটা আবছা-অন্ধকারে আচ্ছন্ন। মাঝে-মাঝে স্তিমিত বিজলী-আলো ফুটে বেরুচ্ছে ছাদ বা দেয়াল থেকে। তারই জন্যে অন্ধকারটা প্রগাঢ় হতে পায়নি। রণদার স্থির বিশ্বাস—এ-বাড়ীটা মাটির তলায় গড়া। কাজেই উপরে ওঠা মানেই আলোক-রাজ্যের নিকটবর্ত্তী হওয়া। উপরেই মুক্তি। উপরেই স্বাধীনতা।

হঠাৎ সিঁড়ি শেষ হয়ে গেল একটা প্রশস্ত চাতালের মুখে এসে। সেখান থেকে ডাইনে ও বাঁয়ে স্বল্পালোকিত দালান বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত। রণদা তো পথ চেনে না, সে ভাগ্যের উপর নির্ভর ক'রে ডাইনের দিকে ছুটলো।

···একি! সারি-সারি কক্ষ! সারি-সারি খোলা দরজা! কোনো ঘরে একজন, কোনো ঘরে দু'জন লোক। মেজেতে মা-কালীর ক্ষুদ্র পট, তারই সম্মুখে হাত জোড় ক'রে চক্ষু মুদে ব'সে আছে ওরা সবাই। গভীর বিস্ময়ে রণদার গতি আপনিই মন্থর হয়ে এলো। ভাবলে, একি—মায়ারাজ্য নাকি?

তিন-চারখানা ঘর এইভাবে পার হয়ে এলো রণদা। হঠাৎ একি? কে ঐ ছেলেটি? বাঁশজুড়ির কুমারের ফটো

দেখে এসেছে রণদা রাজবাড়ীতে। সে অস্ফুট চীৎকার ক'রে ছুটে এলো ঘরের ভিতর মুক্ত দ্বার-পথে।

ফুটন্ত পদ্মফুলের মতো সুন্দর ছেলেটির কপালে রক্ত-ত্রিপুণ্ড্র, পরনে লাল চেলি, গলায় জবার মালা। মায়ের পটের সম্মুখে হাঁটু গেড়ে ব'সে সে জোড়হাতে বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে কি বলছে যেন। হ্যাঁ, বেশ বোঝা যায় তো। খোকা বলছে—"মা! মা! কবে আমায় নিবি মা, কোলে তুলে? আমার যে আর ভালো লাগে না এখানে। আমি যাবো তোর কাছে, আমায় নিয়ে যা মা, নিয়ে যা!"

পাগলের মতো রণদা গিয়ে জাপটে ধরলে খোকাকে। "খোকা! খোকা! চলো, তোমার মায়ের কাছে নিয়ে যাই তোমায়। বাঁশজুড়ির রাণী যে তোমার মা, তা কি মনে নেই তোমার? কেঁদে-কেঁদে যে মায়ের দুটি চক্ষু অন্ধ হয়ে গেল, তোমার শোকে..."

আশ্চর্য্য! খোকার একটি কোমল-ধাক্কায় রণদার মতো বলবান পুরুষকে পিছিয়ে আসতে হলো, দরজার কাছাকাছি। খোকা উদাসীন নেত্রে রণদার পানে তাকিয়ে শান্ত স্বরে বললে—"বাঁশজুড়ির মা? তাঁর কাছে তো বিদায় নিয়ে এসেছি আমি। লোকে যদি অবুঝ হয়ে অকারণে কষ্ট পায়, আমি তার কি করতে পারি? মা? আমার মা এই যে! এঁকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না আর। যাও, তুমি বিরক্ত করো না আমায়।"

রণদা কী যে উত্তর করতে যাচ্ছিলো তা সে-ই জানে! কিন্তু সে-কথা উচ্চারণ করবার আর সময় পেলে না সে। ঠিক তার কানের কাছে একটা অনুচ্চ হাসি বেজে উঠলো—শাণিত···নিষ্ঠুর···ব্যঙ্গহাস্য! পিছন ফিরে তাকাবার আগেই সে বুঝতে পারলে—এ-হাসি ঠাকুরমশাই ছাড়া আর কারো নয়।

পর-মুহূর্ত্তেই একটা ভারী হাত তার কাঁধের উপর এসে পড়লো—লোহার মতো ভারী। আর সেই হাতের স্পর্শে অজ্ঞান হয়ে মেজের উপর লুটিয়ে পড়লো রণদা। পড়তে-পড়তেও খোকার প্রার্থনা তার কানে এসে বাজলো আবার—"নে মা, তোর কাছে আমায় নিয়ে যা, তোর সাথে আমায় মিশিয়ে নে, এ-নোংরা পৃথিবী আর ভালো লাগে না আমার, না—না, ভালো লাগে না।"

চার

সুহৃৎ চৌধুরী অস্থির হয়ে পড়েছেন, কারণ, তিনি রণদার সুহৃদ। একা অস্থির হয়েই ক্ষান্ত হননি তিনি, কলকাতার এন্তার পুলিশ-ফোর্সকে অস্থির ক'রে তুলেছেন। সহরের বে-সরকারী গোয়েন্দাদের অগ্রগণ্য, সরকারী-গোয়েন্দাদের পরামর্শদাতা ও মুরুব্বি যে রণদা মল্লিক, তাকেও যদি গুম্ হতে হয় বদমাইসদের হাতে, তাহলে তো আর পুলিশের শাসন টেকে না মোটেই!

রামচরণের মৃতদেহ মর্গে পাঠিয়ে, রণদাকে নিয়েই থানায় ফিরছিলেন সুহৃৎ। চাকর যখন মরে গেল, তখন রণদার খাবার কে তৈরী ক'রে দেয় বাড়ীতে? প্রধানতঃ খাওয়াবার জন্যেই ধরে আনা তাকে। আলোচনাও যথেষ্ট হলো অবশ্য।

খেয়েই উঠে পড়লো রণদা। বাড়ী খালি। উপরন্তু বনমালীবাবুদের ব্লকে যাওয়ার যে দরজাটা, সেটা ভেঙে ফেলা হয়েছে! মেরামত ক'রে দেওয়া দরকার চট্‌পট্! রণদার ভূতুড়ে-বাড়ীর সঙ্গে নিজের গৃহের একটা দরজার আড়ালও না থাকে যদি, তাহলে বনমালী-গৃহিণীর ঘুম হবে না রাত্রে!

সন্ধ্যায় রণদার থানায় আসবার কথা আবার। কিন্তু এলো না সে। রাত্রি ন'টা নাগাদ তার বাড়ীতে ফোন্ করলেন সুহৃৎ।...নো রিপ্লাই। সুহৃৎ চিন্তিত হয়ে উঠলেন। লোক পাঠালেন রণদার বাড়ী। সে ফিরে এসে বললে—"বাড়ীর দরজায় তালা ঝুলছে। বনমালীবাবুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি জানিয়েছেন, দুপুরে সেই যে রণদা সুহৃদের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে, তারপর আর বাড়ী ফেরেনি।

একজন্ কনেষ্টবলের কাছে কিঞ্চিৎ খবর মিললো। রণদা যখন থানা থেকে বেরিয়ে যায়, গেটের সুমুখেই এক সাধুজীর সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। গেরুয়া-পরা ছিল বলেই লোকটিকে সাধু ব'লে ধ'রে-নেওয়া। সাধুজী রণদাবাবুর কাঁধে হাত দিয়ে কী যেন বলছিল। তারপর দু'জনে হেঁটে চলে গেল ফুটপাথ বেয়ে। ব্যাপারটাতে সন্দেহজনক কিছু দেখতে পায়নি কনেষ্টবলটি, কাজেই ও-নিয়ে আর মাথা ঘামায়নি একটুও।

সে মাথা ঘামায়নি বটে, কিন্তু সুহৃদের কপাল বেয়ে দরদর ক'রে ঘাম বেরুতে লাগলো। আবার সাধু? সেই জবাফুল উপহারদাতা সাধুজী না কি? রণদা বিপদে পড়েছে, তাতে সন্দেহমাত্র নেই। সুহৃৎ এখন করেন কি? তিনি হেডকোয়ার্টারে ছুটলেন ডেপুটি-কমিশনারের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যে।

আধঘণ্টা বাদে সহরে তোলপাড় সুরু হলো। গেরুয়া

দেখলেই পুলিশ ছুটে আসছে। সন্ন্যাসীদের নামধাম-লেখা দিস্তে-দিস্তে কাগজ লালবাজারে চালান হতে লাগলো, ঘণ্টায়-ঘণ্টায়। যে-সব সাধু নাম দিতে নারাজ, তাঁরা নিজেরাই চালান হয়ে গেলেন দলে-দলে। হুলুস্থুল!

পূরো চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেছে, রণদার সন্ধান হয়নি। বহু চেষ্টায় আজকের কাগজ থেকে ঘটনাটা উহ্য রাখা হয়েছে। কিন্তু কাল আর ঠেকানো যাবে না কাগজওয়ালাদের। পুলিশের মুখে চুন-কালি লেপে ছাড়বে ওরা। তিন দফা নালিশ করবে ওরা—এটা দিব্য চক্ষে দেখতে পেলেন লালবাজার কর্তৃপক্ষ। প্রথম দফা: ছাপ্পান্ন জন জলজ্যান্ত মানুষ গুম্ হয়ে গেছে, তাদের একটিরও খোঁজ করতে পারেনি পুলিশ! দ্বিতীয় দফা: শেষকালে বিখ্যাত গোয়েন্দা একজন গুম্ হয়ে গেল, তারও কিছু প্রতিকার করতে পারলে না পুলিশ। তৃতীয় দফা: নিজেদের অক্ষমতা ঢাকবার জন্যেই বোধহয় নির্বিরোধী সাধুসন্ন্যাসীদের নিয়ে টানাটানি ক'রে বেড়াচ্ছে পুলিশ! একেবারে চূড়ান্ত!

রাত্রি ন'টা আবার। সুহৃদের অন্তঃপুর থেকে তিনবার খবর এসে গেছে, তবু সুহৃৎ খেতে যাননি। মনটা বড়ই খারাপ। রণদা অনেকদিনের বন্ধু! শেষটা কি মারাই পড়লো ঐ জবাফুলওয়ালাদের হাতে?

এমন সময়ে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো থানার সুমুখে। সুহৃৎ বিশেষ মনোযোগ দিলেন না, কিন্তু প্রাঙ্গণে যে-সব

কনষ্টেবল ইতস্তত দাঁড়িয়ে বা ব'সে ছিল, তারা চঞ্চল হয়ে ছুটোছুটি সুরু করলে। সুহৃৎ মুখ বাড়ালেন ওদিকপানে। নিজের চোখকে চট্ ক'রে বিশ্বাস করতে সাহস হলো না তাঁর। ঐ তো রণদা!

ব্যাপার কী? ব্যাপার কী? ব্যাপার একেবারে মক্ষম! সাধুজীর সঙ্গে দেখা থানার গেটেই। "রণদা, চিনতে পারছো ভাই?" ব'লে পরম অন্তরঙ্গভাবে সাধুজী হাত দিলেন রণদার কাঁধে। চিনতে রণদা পারেনি, এবং চেনবার আগ্রহও তার লোপ পেয়ে এলো ক্রমশ। একটা ইচ্ছা-শক্তির লড়াই চললো সাধুজী ও রণদার ভিতরে। দু'জনের চোখে-চোখে হানাহানি চলতে থাকলো, বিদ্যুৎভরা দৃষ্টির ভিতর দিয়ে। সাধুর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নেবার সামর্থ্য রণদার হলো না···যেমন হলো না তার চেঁচিয়ে উঠবার বা টেনে ছুট দেবার শক্তি। এক মিনিট বাদেই সাধুর পাশে-পাশে সে দিব্যি হেঁটে গিয়ে উঠলো এক ট্যাক্সিতে। ট্যাক্সি কোন্ পথে কোথায় গিয়ে থামলো—তা কিছু মনে নেই রণদার। সে জেগে-জেগে ঘুমোচ্ছিলো বলেই মনে হয় যেন।

রুদ্ধ-নিশ্বাসে সুহৃৎ শুনলেন এইপর্য্যন্ত। মুখে কথাটি নেই তাঁর। সত্যই বলেছিল রণদা সেদিন—এ শত্রুরা পিস্তলবাজ বা বোমারু-দস্যুর চাইতেও সাংঘাতিক। এভাবে যদি ভর্-দিনেরবেলায় একটা উঁচুদরের, বুদ্ধিমান লোককে উড়িয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় বদমাইসেরা,

তাহলে তো আইনকানুন পুলিশ মিা...ীর ও স্বামীর বন্ধুর যায়!

মহু তর্জন

রণদা ততক্ষণ পাতালপুরীর বর্ণনা দিতে সুরু ক...তে

জ্ঞান হতেই সে সুমুখে দেখলে এক দীর্ঘদেহ ব্রাহ্মণকে, যার মূর্ত্তি দেখলেই যুগপৎ মনে উদয় হবে ভক্তি ও ভয়। তিনি নিজের মুখে বলেছেন, একশো আটটি নরবলি দেবার জন্যে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আধাআধি-পরিমাণ বলি ইতিমধ্যেই সমাধা হয়ে গেছে বোধহয়। এখনও পাতালপুরীর প্রতি কক্ষে বলির মানুষ সব মজুত হয়ে আছে। অধীর-আগ্রহে দিন গুণছে, কবে মা তাদের কোলে টেনে নেবেন, ঘাড়ের উপর খাঁড়াখানি পলকের তরে ছুঁইয়ে দিয়ে! আরও সাংঘাতিক কথা—ঐ স্বেচ্ছাবন্দীদের দলে বাঁশজুড়ির কুমারও রয়েছে! তাকে ফিরিয়ে আনবার প্রস্তাব করতেই সে য়্যায়সা এক ধাক্কা দিলে রণদাকে...

রণদা কি ক'রে ফিরে এলো, তাও সে জানে না। জ্ঞান যখন হলো, তখন সে সহরের এক বিখ্যাত হাসপাতালে। সেখান থেকেই ট্যাক্সি নিয়ে সে সোজা সুহৃদের কাছে এসে উঠেছে।

সুহৃৎ নিস্তব্ধ। মুখ দিয়ে তার কথা তো বেরুচ্ছেই না, মনও যেন ধারণা করতে অক্ষম, এমনধারা একটা অবস্থা! এই কলকাতা শহর—কাঁদুনে-গ্যাস ও পিস্তল রাইফেল নিয়ে অপরাজেয় পুলিশবাহিনী যেখানে দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব

কনষ্টেবল ইতস্তত দাপি ভূগর্ভে চলছে অকুতোভয় কাপালিকদের ছুটোছুটি সুরু ক···যারা যখন খুশী শহরের মানুষ চুরি ক'রে নিজের পরবলি দেয়, এবং নিজেদের কার্য্যকলাপ দেখাবার জন্যে পৈগোয়েন্দাদের ডেকে নিয়ে যেতেও ভয় করে না!

দুই বন্ধু খেতে বসেও মৃদুস্বরে ঐসব আলোচনাই করছিলেন। সুহৃৎ জিজ্ঞাসা করলেন—"হ্যাঁ, ঐ ঠাকুরটির চেহারা কি-রকম, কৈ বললে না তো?"

রণদা বললে—"মূর্ত্তিমান ব্রহ্মতেজ হে! টক্‌টকে রং··· কুচ্‌কুচে কালো চাপদাড়ি···কপালে রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্র··· লাল চেলি-পরা ধব্‌ধবে সাদা পৈতে—

সুহৃদের মুখে অস্ফুট-বিস্ময়ের শব্দ শুনে রণদা চমকে উঠলো। "কী হলো হে?"—জিজ্ঞাসা করলে সে, আহারে ক্ষান্ত হয়ে।

—"ঠিক ঐ চেহারার এক বামুনকে যে আজই সকালে দেখেছিলাম?"—রণদাকে হতবাক্ ক'রে দিয়ে এই কথা ব'লে উঠলেন সুহৃৎ।

—"দেখেছো? ঐ চেহারার?···আজই সকালে?"···থেমে-থেমে বললে সে অতিকষ্টে। "কোথায় দেখেছো?"

—"ঐটেই মনে করতে পারছিনে! রোঁদে বেরিয়েছিলাম —লোয়ার সার্কুলার রোডের কোন্‌খানটায় যে—তাইতো, লোয়ার সার্কুলার রোড? না—ল্যান্সডাউন রোড? না— ডায়মণ্ডহারবার রোড? যাক্, মনে করতে পারছি নে কিছুতেই!"

সুহৃৎ-গৃহিণী একটু দূরে দাঁড়িয়ে স্বামীর ও স্বামীর বন্ধুর আহার পর্য্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি এইবার মৃদু তর্জন ক'রে বললেন—"থাক্, থাক্, এখন আর মনে করতে হবে না! সারাদিন পরে, ঠাণ্ডা হয়ে এখন দুটি খাও!"

কাজেই তখন আর ব্যবসাগত আলাপ চললো না। রণদাই দু-একটা রসালাপের অবতারণা করবার ব্যর্থ চেষ্টা করলে দু' একবার, তারপর আহার শেষ ক'রে, বসবার ঘরে এসে সোফায় অঙ্গ ঢেলে দিলেন দু'জনে। গৃহিণী তখন নিজে কিছু খেয়ে নেবার চেষ্টায় আছেন। কাজেই দুই বন্ধু এখন আবার একটু সুযোগ পেলে, নিষিদ্ধ প্রসঙ্গ আলোচনার। রণদা এইখানেই রাত্রিযাপন করবে আজ—এইরকমই বন্দোবস্ত হয়েছে।

সুহৃৎ বললেন—"জানো রণদা! কথাটা মনে আসছে আসছে, আবার হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ ওটা মনে করতে পারা একান্ত আবশ্যক, ঐ কোথায় সেই নরঘাতককে আমি দেখতে পেয়েছিলাম—সেই কথাটা!"

—"আবশ্যক তো বটেই!" রণদা উত্তর করলে—"কারণ, ঠাকুরকে যেখানে দেখা গিয়েছিল, তার পাতালপুরীর সুড়ঙ্গের মুখ, তারই কাছাকাছি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তোমার যে মনে পড়ছে না, এতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই! মা-কালী সব-রকমেই রক্ষা ক'রে চলবেন তাঁর প্রিয় ভক্তদের, এইটেই তো স্বাভাবিক!"

সুহৃদের মুখ-চোখ বিবর্ণ হয়ে গেল। ধীরে-ধীরে তিনি বললেন—"কথাটা ভালো নয়। এখনও আমি চোখের উপর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সে-ছবি। একটা খোলার ঘরের সুমুখে, ফুটপাতের উপর ঐ ঠাকুর দাঁড়িয়ে। কাছেই একটা কী-যেন গাছ। খোলার ঘরের ভিতরে কোন্ গরীব-গেরস্তর হাঁড়িকুড়ি রয়েছে, তাও আমি পরিষ্কার দেখছি এখনো। কিন্তু আশে-পাশের কিছুই আর চোখে বা মনে পড়ছে না! রাস্তাটা কি লোয়ার সার্কুলার? না, ল্যান্সডাউন? না, ডায়মণ্ড হারবার?"

সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে রণদা বললে—"তার আর হয়েছে কি! কাল আমরা ঐ তিনটে রাস্তাই একে-একে ঘুরে দেখবো। খোলার ঘরের সুমুখে তো গাছ? দেখাই যাক না!"

রাত্রি গম্ভীর হয়ে এলো। রণদা তো ক্লান্ত বটেই, সুহৃৎও কম ক্লান্ত নন্। দু'জনে শয়ন করতে গেলেন যার-যার ঘরে।

তন্দ্রাঘোরে রণদা যেন দেখছে—ঠিক তার সুমুখেই দাঁড়িয়ে আছেন কাপালিকঠাকুর। কালো-কুচ্‌কুচে দাড়ির ভিতর থেকে একটু হাসির ঝিলিক দেখা যায় যেন। তিনি সরস মিষ্টি-স্বরে বলছেন—"মায়ের আবার রুচি-অরুচির ঝামেলা বড্ড বেশী কিনা! অপছন্দ লোক একটিকেও তিনি নেবেন না!"

রণদা যেন জিজ্ঞাসা করতে চাইলে—"কাদের এবং কি-রকম পছন্দ করেন, মা?"

এ-প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর যেন গোঁ-গোঁ ক'রে উঠলেন হঠাৎ। এ কি—ক্রোধের তর্জন ? না, কাতর আর্ত্তনাদ ? তন্দ্রা ছুটে গেল রণদার !···কোথায় ঠাকুর ? অন্ধকার ঘরে বিজলী-পাখার বন্‌বন্ শব্দ শুধু !

—কিন্তু, কোথায় যেন একটা গোঁ-গোঁ শব্দ সত্যিই শোনা যায় না ? রণদা লাফ দিয়ে উঠলো শয্যা ছেড়ে। সুইচ্‌টা টেনে দিতেই আলোর বন্যা এসে প্লাবিত ক'রে ফেললে ঘর ও দালান। হ্যাঁ, দালানের কিয়দংশ আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, কারণ, ঘরের দরজা খোলা।

ঘরের দরজা খোলা ? কেন খোলা ? রণদা কি শোবার সময় দরজা খুলে শুয়েছিল ? অসম্ভব ! রাত্রে দরজা সে কোনোকালেই খুলে রাখে না। বিশেষ, এখন তো সে রাখবেই না ! এখন যে চারিদিকে প্রাণঘাতী শত্রু !

কিন্তু সত্যিই দরজা খোলা ! রণদা ছুটে বেরুলো ! আশে-পাশে সমস্ত ঘরেই হাঁ ক'রে রয়েছে বড়-বড় দরজা। আলোও জ্বলছে প্রতি-ঘরে। এ কী ব্যাপার ?

আলো জ্বেলে মুক্তদ্বার কক্ষে সবাই অচেতন হয়ে ঘুমোচ্ছে। আশ্চর্য্য ! অস্বাভাবিক ! রণদা ছুটলো দক্ষিণ-প্রান্তের ঘরে। সেই ঘরেই সুহৃদ শয়ন করে।

খোলা-দরজায় চৌকাঠের উপর লম্বা হয়ে প'ড়ে আছেন সুহৃদের স্ত্রী, তাঁরই মুখ থেকে মাঝে-মাঝে বেরুচ্ছে ঐ কাতর

গোঙানীর শব্দ! সুহৃৎ নেই কোথাও। না ঘরে, না দালানে, না বাথরুমে! উপে গেছে সুহৃৎ!

ছুটে বেরুলো রণদা থানার দিকে। পাহারায় রয়েছে সঙ্গীনধারী সান্ত্রী। সে দেখেছে বইকি বড়বাবুকে। হ্যাঁ, মিনিট-পাঁচেক আগেই তো বড়বাবু বেরিয়ে গেলেন। সরকারী-গাড়ী নিয়েই বেরিয়েছেন তিনি। গাড়ী তো সদা-সর্বদাই তৈরী থাকে! কখন যে কোন্‌খান থেকে পুলিশের জন্যে আহ্বান আসবে, তার ঠিকানা কি?

হ্যাঁ, বড়বাবু নিজেই ড্রাইভ ক'রে বেরিয়ে গেছেন। সঙ্গে একটি লোক ছিল বটে, কিন্তু সান্ত্রী তাঁকে লক্ষ্য করেনি। একটু দূরে-দূরেই ছিল সে, এবং গাড়ী বেরুনো মাত্র তাতে উঠে চেপে বসেছিল। তার গায়ে একটা চাদর জড়ানো ছিল ব'লে মনে হয় যেন।

রণদা এক তিলও দ্বিধা বা ইতস্তত করলে না। সেকেণ্ড-অফিসারকে ডাকতে পাঠিয়ে নিজেই টেলিফোন ধ'রে বসলো। ···লোয়ার সার্কুলার রোড।···ল্যান্সডাউন রোড!···ডায়মণ্ড-হারবার রোড! এবং আশ-পাশের আরও-আরও ছোট-বড় রাস্তা! যত থানা ও ফাঁড়ী আছে ঐসব রাস্তায়, সবাইকে টেনে তুললে রণদা, বিছানা থেকে। যত গাড়ী চলছে এখন ও-সব রাস্তায়, সব থামাতে হবে, যে-কোনোপ্রকারে হোক থামাতে হবে। গাড়ীর টায়ার ফাটিয়ে দিতে হয় যদি গুলি ক'রে, তাও দিতে হবে। কোনো গাড়ীতে ইনস্পেক্টর সুহৃৎ চৌধুরীকে

দেখতে পাওয়া গেলে, তাঁকে আটকাতে হবে, কারণ, তিনি পাগল হয়ে গেছেন অকস্মাৎ। তাঁকে না থামালে দুর্ঘটনা অনিবার্য্য।

সেকেণ্ড-অফিসার চক্ষু মার্জন করতে-করতে উঠে এসেছিলেন। রণদার শেষ টেলিফোনের শেষ-দিকটা শুনতে পেলেন। তাঁর চক্ষু চড়ক-গাছ হয়ে উঠলো। সুহৃৎবাবু পাগল হয়েছেন, না পাগল হয়েছে—রণদা? থানার ইনস্পেক্টর গাড়ী নিয়ে বেরিয়েছেন রাত্রে, নিশ্চয়ই বেরুবার দরকার হয়েছিল। রণদা কে, যে তাঁকে আটক করবার হুকুম দেয়? হতে পারে সে নামকরা গোয়েন্দা, হতে পারে সে সুহৃৎবাবুর ব্যক্তিগত বন্ধু, তাই ব'লে এ-রকম অনধিকার-চর্চ্চা তাকে করতে দেওয়া যায় কিরূপে? গোটা-দশেক টেলিফোন হয়ে যাওয়ার পর সেকেণ্ড-অফিসার রণদার হাত চেপে ধরলেন—"আপনি করছেন কি, রণদাবাবু?"

রণদার এমন সময় নেই যে, তর্কে-বিতর্কে মন দেবে। প্রতি মুহূর্ত্তে সুহৃৎকে উদ্ধার করার ক্ষীণ আশা ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে। সে জোর করেই সেকেণ্ড-অফিসারের হাত ছাড়িয়ে রিসিভার কানে তুলতে যাচ্ছে,—এমন সময়ে ক্রিং ক্রিং ক্রিং...

সমসেরডাঙ্গা ফাঁড়ি-স্পীকিং। ডায়মণ্ডহারবার রোডের প্রায় শেষ মাথায়! ওখানেই সর্ব্বপ্রথম ফোন্ করেছিল রণদা, মিনিট-দশেক আগে!

ওরা খবর দিচ্ছে—"সুহৃৎবাবুর গাড়ীর এ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে। শীগগির আসুন!"

পাঁচ

মিনিট-পনেরোর ভিতর থানার গাড়ী পৌঁছে গেল সামসেরডাঙ্গা ফাঁড়ির সুমুখে। সাব্ইন্স্পেক্টর গেটের কাছেই অপেক্ষা করছিলেন, লাফিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলেন— আরও খানিকটা-দূর যেতে হবে !

ফাঁড়ির সুমুখেই সুহৃৎবাবুর গাড়ী আটকাবার চেষ্টা হয়। ফোন পাওয়ার পর, ঐ গাড়ীই প্রথম চোখে পড়লো ফাঁড়িওয়ালাদের। এদিকে অত রাত্রে বেশী গাড়ী চলেও না !

রাস্তার মাঝখানে আলো ধ'রে দাঁড়িয়েছিল একটা কনেষ্টবল। গাড়ীর চালক গ্রাহ্যও করলে না তাকে। তীরবেগে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। মোটর-বাইক নিয়ে সাব্ইন্স্পেক্টর প্রস্তুতই ছিলেন। তিনি চোঁ ক'রে পশ্চাদ্ধাবন করলেন। মুহুর্মুহুঃ গর্জ্জে উঠতে লাগলো তাঁর পিস্তল, গাড়ীর চাকা লক্ষ্য ক'রে। কিন্তু পিস্তলের পাল্লার বাইরে রয়ে গেছে গাড়ী এবং সাব্ইন্স্পেক্টর ছুটতে-ছুটতে তাক্ও ঠিক করতে পারছেন না। গাড়ী থামাবার আশা, দুরাশা বলেই মনে হতে লাগলো।

হঠাৎ সুমুখে পড়লো, বিচালি-ভরা মোষের গাড়ী একখানা। ঠিক রাস্তার মাঝখানটি জুড়ে [illegible] াইলস্করী-চ.র, চলেছে সে। মোটর থেকে ক্রমাগত হর্ণ বাজতে লাগকে

গাড়োয়ান ঘুমিয়ে পড়েছিল। নিদ্রাভঙ্গে ব্যস্ত হয়েই গাড়ী বাঁয়ে সরাবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু মোষের গাড়ী ঘোরানো, এক সেকেণ্ডের কাজ নয়। যেটুকু বিলম্ব অনিবার্য্য ভাবেই ঘটলো, তারই ভিতরে মোটর-বাইক আর মোটর-গাড়ীর ব্যবধান অর্দ্ধেক কমে গেছে।

উল্লসিত হয়ে দারোগাবাবু বাইক থামিয়ে ভালো ক'রে তাক্ করতে লাগলেন, এইবার টায়ার ফাটাতেই হবে। আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে মোটরগাড়ীর আরোহীরাও অচেতন ছিল না, তারা আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা করলে একটা। গাড়ী সবেগে চালিয়ে দিলে ডান-দিক ঘেঁসে।

ডাইনে যেটুকু রাস্তা খোলসা ছিল, তাতে গাড়ী বেরিয়ে যাওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল না। ধীরে-ধীরে সাবধানে চালালে নিরাপদেই হয়তো যেতে পারতো এগিয়ে। কিন্তু ব্যস্ততার দোষ অনেক। গাড়ী গড়িয়ে পড়লো ড্রেনের ভিতর। সুহৃৎবাবু ছিলেন চালকের আসনে। তিনি একদম চাপা পড়েছিলেন গাড়ীর নীচে, তবে সৌভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে আছেন, এবং এমন-কিছু সাংঘাতিক আঘাতও লাগেনি তাঁর দেহে।

—"আর কে ছিল গাড়ীতে?" ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে রণদা।

—"ছিল একটা কেউ। কিন্তু কি ক'রে যে সে-লোকটা হুড়ি-পড়া গাড়ীর তলা থেকে বেরুলো এবং স্বচ্ছন্দে হেঁটে

চলে গেল আমাদের সুমুখ দিয়ে, তা মোটেই বুঝতে পারলাম না মশাই। আমরা তার পা লক্ষ্য ক'রে গুলি পর্য্যন্ত চালিয়েছিলাম, কিন্তু একটাও লাগেনি তার গায়ে।"

রণদার গাড়ী ততক্ষণে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গেছে। সুহৃদের গাড়ী ড্রেনের ভিতর প'ড়ে আছে তখনো, তবে সুহৃৎকে তুলে রাস্তার উপর রাখা হয়েছে। তার কপালে খানিকটা রক্ত, হাতে-পায়ে ব্যাণ্ডেজ। চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, এবং মুখে সকাতর 'মা-মা' রব!

রণদাকে দেখে চিনতে মোটেই কষ্ট হলো না সুহৃদের। সে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো—"এ তোমরা কী করলে রণদা? মা যে আমায় ডেকেছিলেন! আমি মায়ের ছেলে, মায়ের কোলে ফিরে যাচ্ছিলাম, তোমরা এমন ক'রে বাধা দিলে আমায়? নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর! মা, তোর ইচ্ছা দলিত করবার শক্তিও কি মানুষের থাকে?"

রণদা স্তম্ভিত, হতবাক! এ আর বাঁশজুড়ির কুমারের মতো দুগ্ধপোষ্য শিশু নয় একটা! পরিণত বুদ্ধি, ইউনিভার্সিটির এম্-এ, পুলিশবাহিনীর ভিতর অগ্রগণ্য অফিসার একজন, সে নরঘাতকের কুহকে অভিভূত হয়ে 'মা-মা' ক'রে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে? উপন্যাসেও যে এমন কাহিনী পড়া যায়নি কখনো!

রীতিমত জোর ক'রে সুহৃৎকে গাড়ীতে তুলতে হলো। সে যাবে না, কিছুতেই ফিরে যাবে না ওদের সাথে! তাকে

মায়ের কাছে পৌঁছোতেই হবে! মায়ের ডাক সে শুনেছে। যারা অতি-বড় ভাগ্যবান, তারাই শুনতে পায় সে আহ্বান! ভাগ্যহীন, অন্ধ রণদার সাধ্য কি সুহৃৎকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে আনবে, পূতিগন্ধময় সংসারে আবার ডুবিয়ে মারবার জন্যে?

আগে-পিছে পুলিশের গাড়ী ও মোটর-বাইক! একদিকে রণদা, আর-একদিকে থানার সেকেণ্ড-অফিসার, অনাদিবাবু—দু'জনে সাবধানে ধ'রে রেখেছেন সুহৃৎকে। অনাদি ফিস্-ফিস্ ক'রে বললে রণদাকে—"এটা কি হচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছি না কিন্তু রণদাবাবু! সুহৃৎবাবু আমার উপরওয়ালা। এভাবে কয়েদীর মতো তাঁকে ধ'রে নিয়ে যাওয়ার কী অধিকার যে আমার আছে…"

পরিষ্কার নীল আকাশ। ঝক্‌ঝক্ করছে লক্ষ তারকা! একফালি চাঁদও রয়েছে দিগন্তের মাথায়। মেঘের লেশমাত্র কোথাও নেই, হঠাৎ ঝড় উঠলো।

ঝড়! সোঁ-সোঁ-সোঁ গর্জ্জন করছে শৃঙ্খলমুক্ত প্রভঞ্জন, সমরমুখী দৈত্য-সেনার মতো। বড়-বড় গাছ আর্ত্তনাদ ক'রে ভেঙে পড়ছে মড়্-মড়্-মড়! কোথায় যেন খল্-খল্ হাসির আওয়াজ উঠছে দমকে-দমকে! এই শিক্ষিত সাহসী পুলিশ-কর্ম্মচারীগুলির মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠলো হঠাৎ। সবাই স'রে আসতে লাগলো পরস্পরের কাছে…আরও কাছে! অগ্রগতি ক্রমশ মন্থর হয়ে এলো। আর সেই ঝড়ের গর্জ্জনের

সঙ্গে সমানে তাল রেখে গাড়ীর ভিতরে সুহৃৎ ক্রমাগত চেঁচিয়ে যাচ্ছে—"মা, মা, মা, মা !"

হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড শাখাবহুল বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হয়ে রাস্তার উপরে প'ড়ে গেল, গাড়ীর গতিরোধ ক'রে। আর চারদিক থেকে উঠলো একটা বিকট অট্টহাস্যের রোল ! দু-একজন চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো—"নামিয়ে দাও সুহৃৎবাবুকে, তা নইলে আমরা সবাই মারা যাবো আজ !"

চিরনির্ভীক রণদার মনেও একটা আতঙ্কের কালো ছায়া কোথা থেকে যেন ধীরে-ধীরে সঞ্চারিত হচ্ছে। এ-সব কী ? কাপালিকঠাকুরের ভেল্‌কি যে এ-সব, তাতে অবশ্য কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। কিন্তু যত শক্তিমান তান্ত্রিকই তিনি হোন না কেন, ঠাকুর কি ইচ্ছামতো ঝড় তুলতে পারেন, আর ডাকিনীর দলকে লেলিয়ে দিতে পারেন, মানুষের পিছনে ? তারপর, এই বিংশ-শতাব্দীর মাঝামাঝি পৌঁছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পীঠস্থান কলকাতা রাজধানীতে ব'সে কি—ডাকিনী-যোগিনীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে হবে অবশেষে ?

রণদা ব'সে আছে গাড়ীর দরজা ঘেঁসে। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়লো বাইরের দিকে। দরজা ধ'রে গাড়ীর ভিতর-পানে কে উঁকি দিচ্ছে গো ? গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো রণদার। ছায়ামাত্র বটে, কিন্তু ডাকিনীর ছায়া ! পাতালপুরীর সোফায় ব'সে দেয়ালের গায়ে একটা ডাকিনী-মূর্ত্তি রণদা দেখেছিল, ঘড়ি-মাথায় তাণ্ডব-নৃত্যরতা হাড়-বার-করা ডাকিনী !

এ সেই জীবটাই হবে। জীব নয়, থুড়ি, ছায়া। সেই মূর্ত্তিটারই ছায়া এ।

গাড়ী আর চলে না। 'সুহৃৎবাবুকে নামিয়ে দাও'—কলরব উঠছে চারিদিকে। সুহৃৎও থেকে-থেকে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠছে—'আমায় কোলে নে মা, কোলে নে!' রণদা জাপটে ধরেছিল সুহৃৎকে, কিন্তু দরজার উপর দিয়ে ডাকিনীর অস্থিসার হাতখানি এইবার এসে বুঝি কাঁধের উপর পড়লো রণদার! সারা দেহ অসাড় হয়ে এলো তার। সুহৃৎকে ধ'রে রাখা আর বুঝি সম্ভব হয় না তার পক্ষে।

কারা যেন গাড়ীর দরজা খুলে দিলে ওপাশে। অনাদি থর্-থর্ ক'রে কাঁপছে ওখানে, তাকে ডিঙিয়ে সুহৃৎ নেমে যেতে উদ্যত হলো গাড়ী থেকে। আর এক সেকেণ্ড—

হঠাৎ কী যেন একটা ব্যাপার হলো। নারীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ একটা সহসা বিদীর্ণ ক'রে ফেললে ঝঞ্ঝামথিত নৈশ-আকাশ! সুহৃৎ টাল খেয়ে প'ড়ে গেল আবার গাড়ীর ভিতরে। মুখ থেকে তার কাতর অনুযোগ শোনা গেল—"হলো না! আমার মায়ের কাছে যাওয়া হলো না আর।"

রাজপথের এপাশ-ওপাশ জুড়ে প'ড়ে আছে বিরাট মহীরুহ। তার ওধারে এসে দাঁড়িয়েছে দু-তিনখানা মোটর-গাড়ী। তাদের হেড্‌লাইটের আলো, দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে এ-দিকটা। সেই আলোকিত-পথ বেয়ে উন্মাদিনীর মত ছুটে আসে কে ও?

রণদা চিনলে ঐ নারীকে। উনি সুহৃদের স্ত্রী।

আর সেই মুহূর্তেই রণদা অনুভব করলে—তার কাঁধের উপর থেকে ডাকিনীর শীতল করস্পর্শ নেমে গেছে অকস্মাৎ। পাশে তাকিয়ে দেখলে, দরজায় আর সে হাড়-বার-করা ডাকিনী-মূর্ত্তির চিহ্নমাত্র নেই!

সুহৃদের স্ত্রীকে রণদা দেখে এসেছিল মূর্চ্ছিতা। রণদা বেরিয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই বুঝি যাদুমন্ত্রের অশিব-প্রভাব একটু-একটু ক'রে ক্ষীণ হয়ে আসছিল। সুরমার জ্ঞান ফিরে আসতে দেরী হলো না আর। তিনি একটা চীৎকার ক'রে উঠে বসলেন। তাঁর সব মনে প'ড়ে গেল। দরজার বাইরে গম্ভীর-গলায় কে ডেকে উঠেছিল—'সুহৃৎ, এসো!'-ব'লে। সঙ্গে-সঙ্গে আপনা-থেকে ঘরের দরজা খুলে গেল, আর স্বামী তাঁর ধড়্-মড়্ ক'রে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে ছুটে বেরুলেন মুক্ত দ্বারপথে। সুরমাও ছুটলেন তার পিছনে, কিন্তু দরজা পার হওয়ার সাধ্য হলো না তাঁর, পা যেন ভারী হয়ে উঠলো পাথরের মতো! স্বামীকে যতবার ডাকতে গেলেন, মুখ থেকে গোঁ-গোঁ ছাড়া কোনো আওয়াজ বেরুলো না। এইভাবে আড়ষ্ট পদযুগলকে টেনে-টেনে এগিয়ে যাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে-করতে কখন এক-সময়ে তিনি জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে গেলেন।

মূর্চ্ছা ভাঙতেই তিনি ছুটলেন রণদার ঘরে। রণদাও নেই। রহস্যজনকভাবে মানুষ গুম্ হওয়ার খবর সুহৃদের

কাছ থেকে অনেক পেয়েছেন তিনি। ভোজনকালে রণদা যখন সুহৃৎকে বর্ণনা দিচ্ছিলো—মূর্ত্তিমান ব্রহ্মতেজের মতো প্রদীপ্যমান এক দীর্ঘ দেহ ব্রাহ্মণের—টক্‌টকে যাঁর গায়ের রং, কুচ্‌কুচে যাঁর কালো দাড়ি এবং ধব্‌ধবে যাঁর সাদা পৈতে; তখন সুরমার অন্তরাত্মা শিউরে-শিউরে উঠছিল! এ ব্রাহ্মণ কি মানুষ, না অপদেবতা? এ-ব্রাহ্মণের দর্শনলাভ কি তার স্বামীর পক্ষে শুভ হবে, না অশুভ?

রণদা শয্যায় নেই দেখে সুরমা ছুটলেন থানা-ঘরে। বিস্মিত হয়ে পুলিশ-প্রহরীরা পথ ছেড়ে দিলে মা-জীকে। সুরমা টেলিফোন ধরলেন। তাঁর স্বামীর মাথার শিয়রেই টেলিফোন, এক কাণ খাড়া ক'রে রেখেই ঘুমোন তিনি, কারণ তিনি স্পেশ্যাল-ব্রাঞ্চের পুলিশের অতি পদস্থ কর্ম্মচারী। টেলিফোন পেয়েই সুব্রতবাবু এক মিনিটের ভিতর ধড়াচূড়া প'রে বেরুলেন সুরমার উদ্দেশে। সেখানে হাবিলদারের কাছে শুনতে পেলেন, রণদা, সামসেরডাঙ্গার দিকে গেছে গাড়ী নিয়ে। সুরমা, সুব্রতবাবু এবং এক-ডজন কনষ্টেবল বিদ্যুৎবেগে ছুটলেন রণদার পিছনে।

ঝড়? কোথায় ঝড়? ঝড় যা হয়েছে, তা রণদাদের গাড়ীর আশে-পাশেই। তাও সেই মুহূর্ত্তেই থেমে গেল, যে-মুহূর্ত্তে সতী-নারী এসে অশিব-শক্তির সুমুখে দাঁড়ালো, স্বামীর মুক্তি দাবী ক'রে।

ছয়

রণদার এখন প্রধান কর্ত্তব্য হলো—বাঁশজুড়ির জমিদার-বাড়ীতে গিয়ে খোকা-রাজার সংবাদ তার পিতামাতাকে জানানো। প্রধান কর্ত্তব্য বলছি এইজন্যে যে, সুহৃদের তত্ত্বাবধানের ভার সুব্রতবাবুই নিয়েছেন। তাকে এখন ডাক্তার দেখানো দরকার, মায়ের কোলে ফিরে যাবার জন্যে তার এই দুর্নিবার ঝোঁক ঠিক কী-জাতীয় উন্মাদ রোগ, এবং এ-রোগ নিরাময় করবার কোনো ওষুধ আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আছে কি না, সেইটেই এখন নির্ণয় করতে হবে সর্বপ্রথমে।

বাঁশজুড়ির জমিদার-বাড়ীতে সেইদিন থেকে আর যাওয়া হয়নি রণদার। অবশ্য বেশী দিনের কথা নয় সে। মাত্র তিনটি দিন হলো চুরি হয়েছে খোকা-রাজা। ইতিমধ্যেই অপহৃত খোকা-রাজাকে চাক্ষুষ দেখতে পেয়েছে রণদা, সে-কথা প্রতাপবাবুকে জানানো আবশ্যক। অবশ্য, খোকাকে দেখতে পাওয়ার ভিতর রণদার নিজের কৃতিত্ব কিছু ছিল না, এবং তাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেও কৃতকার্য্য হতে পারেনি সে, এ-সব কথা স্বীকার করতে কুণ্ঠাও হবে তার। কিন্তু হোক কুণ্ঠা, কর্ত্তব্য তো করতেই হবে! তাছাড়া একটা জিজ্ঞাস্যও আছে তার রাণীমা'র কাছে।

প্রতাপ রায় সব শুনে গুম্ হয়ে রইলেন। ১০৮ নরবলি?

তাঁর একমাত্র পুত্রকেও অমৃত-সৃষ্টির প্রয়োজনে বলি দেবে ঐ কাপালিক? স্বাধীন-ভারতের রাষ্ট্রশক্তি কি এই পৈশাচিকতার প্রতিরোধে অক্ষম? শুধু যদি জানতে পারা যেতো ঐ পালাতপুরীটা কোথায়, তাহলে একটা উপায় নিশ্চয়ই হতো!

নানাভাবে শোকাহত পিতাকে প্রবোধ দেবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে, তারপর রণদা তার জিজ্ঞাস্য-বিষয়ের অবতারণা করলে। "দেখুন, রাজাবাহাদুর, একটা ধোঁকায় পড়েছি আমি। সুহৃৎবাবুর স্ত্রী তাঁর স্বামীকে রক্ষা করবার জন্যে আকাশ-পাতাল আলোড়ন করেছেন, কোনো মন্ত্রশক্তি তাঁকে অভিভূত করতে পারেনি। কিন্তু আপনার স্ত্রী কেন পুত্রকে নিজে-হাতে তুলে দিলেন, কাপালিকের হাতে?"

—"নিজের হাতে তুলে দিলেন?" বোমার মতো ফেটে পড়লেন রাজা। "আপনি বলছেন কি রণদাবাবু? মা কখনো নিজের হাতে—এ যে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিচ্ছেন আপনি।"

রণদা তখন, মশারিতে চুলের অস্তিত্বের কথা জানালে প্রতাপ রায়কে। চুলগাছি দেখতেও দিলে রাজাকে। রাজা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন—ও চুল তাঁর স্ত্রী ভিন্ন আর কারও হতে পারে না।

রণদা বললে—"খোকার ঘরের দরজা, ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। খোকা বেরিয়ে যাওয়ার পরে সে দ্বার আবার ভিতর থেকে বন্ধ হলো। কে করলে বন্ধ? হয় আপনি, নয়

রাণীমা ! দুটো ঘরেরই ভিতরকার দরজা খোলা ছিল, আপনি জানেন। রাত্রিতে রাণীমা খোকার ঘরে এসে—"

আর শুনতে পারলেন না প্রতাপ রায়। উঠে স্খলিত-চরণে পত্নীর কাছে চললেন। ফিরে এলেন প্রায় আধঘণ্টা পরে। কপালে দরদর ক'রে ঘাম বইছে তাঁর। মুখ হয়ে গেছে শুষ্ক···বিশীর্ণ।

রাজা বললেন—"রাত্রির কথা কিচ্ছু বলতে পারেন না রাণী, তবে তাঁর মনে আছে, সকালবেলা গাড়ীতে বেরিয়েছিলেন খোকাকে নিয়ে। ঐরকম এক জমকালো-চেহারার বামুণকেও নাকি রাস্তায় দেখেছিলেন কোথায়।"

—"কোথায় ? কোথায় ?" উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলে রণদা। প্রতাপবাবু হতাশভাবে মাথা নাড়লেন—"কোথায়, তা রাণী কিছুতেই মনে করতে পারলেন না। মিনিটে-মিনিটে ভিন্ন-ভিন্ন রাস্তার নাম করছেন !"

—"সকালবেলা ক'টা নাগাদ ঠাকুরকে দেখেছিলেন, সেটা মনে আছে রাণীমার ?" রণদা আবার প্রশ্ন করলে।

—"হ্যাঁ, সেটা মনে আছে। ন'টা হবে তখন বেলা !"

রণদা বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। প্রতাপ রায় গাড়ী বার করতে হুকুম করলেন, তিনি গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করবেন তাঁর পুত্রের উদ্ধারের জন্যে। এত সৈন্য, এত উড়োজাহাজ, এত কামান, বন্দুক, বোমা সরকারের হাতে থাকতে, অবাধে নরবলি চলতে থাকবে দেশে ?

ওদিকে বাসের ষ্ট্রাপে ঝুলতে-ঝুলতে রণদা চিন্তা করছিল। সকাল নয়টা! সুহৃৎও রোঁদে বেরুতো ঐ সময়টাতে। বিভিন্ন দিনে, একই সময়ে, একই জায়গায় হয়তো ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল রাণীর ও সুহৃদের। ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়টাতে ঠাকুরের সঙ্গে চোখাচোখি হয় যাদের, তারাই এসে যায় তার কুহকের আওতার ভিতর। রাণী, খোকা ও সুহৃৎ এইজন্যেই বশীভূত হয়েছে তাঁর; সুহৃদের স্ত্রী হন্‌নি—কারণ, তাঁর সঙ্গে বেলা নয়টায় সাক্ষাৎ হয়নি ঠাকুরের।

এ একটা অনুমান মাত্র! কিন্তু গোয়েন্দাদের তো অগ্রসর হতে হয়, অনুমানকে অবলম্বন করেই!

রণদা প্রতিজ্ঞা করলে—বেলা নয়টায় সে রাস্তায় বেরুবে না। বেরুলেই হয়তো মায়ের অরুচিকর বস্তু থেকে রুচিকর হয়ে দাঁড়াবে সে এক লহমার ভিতরে, আর সঙ্গে-সঙ্গেই মায়ের কোলে ছুটে যাবার জন্যে আকুল হয়ে উঠবে সে, খোকা ও সুহৃদের মতো।

ভালো কথা—রাণীকে বলিরূপে সংগ্রহ করতে কোনো চেষ্টা তো করেন্ নি ঠাকুর! কেন? একই সময়ে তো মাতাপুত্র তাঁর দৃষ্টিতে পতিত হয়েছিলেন! এ আর-এক প্রহেলিকা!

হঠাৎ খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে রণদা। সে ভুল ক'রে উল্টো-দিকের বাসে চলেছে। সহরের দিকে না গিয়ে, সামসেরডাঙ্গার দিকে ছুটে চলেছে সে! বিড়ম্বনা!

বাস এবারে থামলেই নেমে পড়তে হবে! রণদা ধীরে-

ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে চললো। ভিড় তখন খুব বেশী নেই! রণদা যখন পাদানির উপর দাঁড়ালো এসে, তখনো বাস থামবার দেরী আছে।

হঠাৎ সে তীরবেগে ছুটে গিয়ে বাসের ভিতর ঢুকলো আবার! ঘড়িতে ঠিক সওয়া-ন'টা। এবং অদূরে ঐ নাম-না-জানা ঝাঁকড়া গাছটার তলায় যে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে—সে—সে—

—টক্‌টকে তার গায়ের রং, কুচ্‌কুচে কালো তার চাপ দাড়ি, এবং ধব্‌ধবে সাদা পৈতে তার লাল চেলির উপর এলিয়ে পড়েছে এসে—শাণিত তলোয়ারের বাঁকা ফলার মতো।

অনেকটা দূরে গিয়ে বাস থেকে নামলো রণদা। তখনও তার বুকের ভিতর ঢিব-ঢিব করছে। এখুনি তো সর্বনাশ হতে বসেছিল! বেলা নয়টা—মারাত্মক মুহূর্ত্ত! এ-সময়ে যে-হতভাগ্য, ঠাকুরের সুমুখে পড়বে, মায়ের রুচি ধাবিত হবে তারই প্রতি। রণদা মল্লিক পিতৃপুণ্যে স্বর্গপ্রাপ্তির নিশ্চিত সম্ভাবনা থেকে রেহাই পেয়ে এসেছে এইমাত্র!

বিপরীত ফুটপাথ ধ'রে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হতে থাকলো রণদা—ঠাকুরের ঘাঁটির দিকে। একখানা মোটর দাঁড়িয়ে আছে নাম-না-জানা ঝাঁকড়া গাছটার কাছেই, এবং—এবং…

—এবং সেই মোটর থেকে নেমে লম্বা-লম্বা পা ফেলে

ঠাকুরের দিকে এগিয়ে আসছেন প্রতাপ রায়, আগে-পিছে দু'জন শালপ্রাংশু দরোয়ান!

রণদা স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলো সেদিক পানে।

ভোজপুরী দরোয়ান বিনা বাক্যব্যয়ে তেল চক্‌চকে লাঠি তুললে ঠাকুরের মাথার উপরে। একটা বজ্রনির্ঘোষ বেরিয়ে এলো প্রতাপ রায়ের মুখ থেকে! আশপাশ থেকে কৌতূহলী পথিক ও দোকানীরা উঁকি দিতে লাগলো এই রোমাঞ্চকর ঘটনার দিকে!

প্রতাপ রায়ের হুঙ্কার শুনেই ঠাকুর ফিরে তাকিয়েছিলেন ওদিকে। আর ফিরে তাকানোর সঙ্গে-সঙ্গেই পুনরায় হুঙ্কার করবার শক্তি বিলুপ্ত হয়ে গেল রায়-মহাশয়ের, মুখটাই কেবল ব্যাদিত হয়ে রইলো নিস্ফল আক্রোশে। আর ব'লে রামভুজ সিংয়ের লাঠি? সে উঁচিয়েই রইলো মাথা লক্ষ্য ক'রে ওঠেও না, নামেও না।

ঠাকুর যেন কি বলছেন ওদের। অতি মৃদু কণ্ঠ। বোধ হয় মিষ্ট ভাষাও নিশ্চয়ই, তা নইলে আক্রমণকারীদের মুখভঙ্গী সেকেণ্ডে-সেকেণ্ডে কোমল থেকে কোমলতর হয়ে আসবে কেন? রণদা বিপরীত ফুটপাথে দাঁড়িয়ে, চিঠির বাক্সের আড়াল থেকে স্পষ্ট দেখতে পেলে, ঠাকুরের দাড়ির ফাঁকে হাসির ঝিলিক, এবং প্রতাপ রায়ের মুখে অদৃষ্টপূর্ব একটা ভক্তিবিনম্র গদ-গদ-ভাব!

রণদা প্রমাদ গণলে।

গবর্ণর-সন্দর্শনে যাত্রা করবার সময়ে প্রতাপবাবুর কি যেন খেয়াল হলো—তিনি ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হ্যাঁরে নাথুনি, সেদিন খোকারাজা আর রাণীজিকে নিয়ে সকালবেলা তুইই তো বেড়াতে বেরিয়েছিলি ?"

—"জী, হুজুর !"···উত্তর দিলে নাথুনি সিং।

—"কোন্ রাস্তায় গিয়েছিলি—মনে আছে ?"

—"হাঁ তো। জজকোর্ট সড়ক দিয়ে রায়লোচন পণ্ডিত রোড, সেখান থেকে ঘুরে এসে সামসেরডাঙ্গার রাস্তা দিয়ে—"

প্রতাপ রায় গবর্ণমেণ্ট-হাউসে যাওয়ার আগে ঐ রাস্তা-গুলো একবার বেড়িয়ে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মনোম-না-জানা ঝাকড়া গাছের তলায় টক্‌টকে ফর্সা—ঐ ঠাকুর-শাইয়ের সঙ্গে তাঁর নাটকীয় সাক্ষাৎ।

তার দু'মিনিট বাদে প্রতাপ রায় নতশিরে গাড়ীতে ফিরে গেলেন, এবং লাঠি বগলে নিয়ে যুগল-দরোয়ান নিরীহ মেষ-শাবকের মতো অনুগমন করলে তাঁর। গাড়ী আর গবর্ণমেণ্ট-হাউসের দিকে গেল না মোটেই, ধীরে-ধীরে ফিরে এসে প্রবেশ করলে, বাঁশজুড়ি-হাউসের সাদা ফটকে।

এদিকে রণদা তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি রেখেছে, ঠাকুরের দিকে। ঠাকুর কোথায় যান, দেখতে হবে। অসম্ভব না হ'লে, অনুসরণ করতে হবে তাঁর। পাতাল-পুরীর সুড়ঙ্গ-মুখ আবিষ্কারের জন্যে সত্যিকার চেষ্টা করতে হবে একটা ! তারপর, পুলিশ এনে···প্রয়োজন হ'লে, কামান দেগে ধ্বংস করতে

হলে, কামান দেগে ধ্বংস করতে হবে ঐ ওস্তাদ-কাপালিকের পৈশাচিক-সাধনার অপবিত্র পীঠস্থান!

ঠাকুরের দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি রেখেছে রণদা। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তার দিকে মুখ করে। মুখে তাঁর দুর্বোধ্য একটা ক্ষীণ হাসি। সুমুখের ফুটপাতে লাল চিঠির বাক্সটার পিছনে-দাঁড়ানো রণদাকে কি চিনতে পেরেছেন তিনি?

রণদা ঠাকুরকে দেখতে পাচ্ছে, ঠাকুরের পিছনে আট-দশ হাত দূরের খোলার ঘরখানার মুক্ত দ্বারও দেখতে পাচ্ছে। মুক্ত দ্বার-পথে একরাশ হাঁড়ি-কুড়ি দেখা যায়...মাটির জিনিসও অনেকগুলো।

একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটতে লাগল। ঠাকুর এক চুলও নড়েননি নিজের জায়গা থেকে। কিন্তু খোলার ঘরের দরজা থেকে তাঁর শ্রীমূর্তির ব্যবধান হঠাৎ এতটা কমে গেল কি করে? মাঝের ফুটপাতটা কি হঠাৎ আপনা থেকে নিজেকে সঙ্কুচিত করে ফেললে নাকি?

আরও কমে যাচ্ছে! ব্যবধান আরও কমে গেল। ঠাকুর ঠিক খোলার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন! ঠাকুর দরজা দিয়ে ভিতরের দিকে পিছিয়ে গেছেন। ঠাকুর দাঁড়িয়েছেন, মেটে হাঁড়ি-কুড়িগুলোর ঠিক সুমুখে! ঠাকুর দাঁড়িয়েছেন গিয়ে ঠিক ঐ হাঁড়ি-কুড়িগুলোর মাঝখানে। সোজা রাস্তার ওপারের লাল চিঠির বাক্সটার পানে তাকিয়ে রয়েছেন ঠাকুর! মুখে তখনো সেই অতি সূক্ষ্ম একফালি হাসি!

যাঃ! ঠাকুর আর নেই!

সাত

নিশুতি রাত। বাঁশজুড়ি-প্রাসাদের চারটে গেটই আলোয় সমুজ্জ্বল। বাগানেও মাঝে-মাঝে জ্বলছে এক-একটা আলো। আর অর্ধমুক্ত বাতায়নপথে বাড়ির ভিতরকার আলোও বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে এসে বাগানে ও রাজপথে।

আলোর অভাব নেই, সশস্ত্র সান্ত্রীও লাল সুরকির রাস্তায় ধীরপদে টহল দিচ্ছে, ঘসর-ঘস শব্দ তুলে। নিদ্রিত রাজবাড়ির রক্ষক এরা—এই আলো আর এই প্রহরী। দস্যু বা তস্কর কি করে ঢুকবে এই সুরক্ষিত পুরীতে?

নিশুতি রাত। নিঃশব্দে একটি দরজা খুলে গেল নীচের তলায়। নিঃশব্দ-চারণে বেরিয়ে এল দুটি মূর্তি। অগ্রবর্তীর পরিধানে গৈরিক বসন, পশ্চাতের লোকটি ধুতি-পাঞ্জাবিতে সুসজ্জিত। ধীরে ধীরে এগিয়ে এল এরা তোরণের দিকে।

তোরণের দুইপাশে লম্বা দালান। গৈরিকধারী একটি দরজায় টোকা দিলে ধীরে ধীরে। অমনি দরজা খুলে বেরিয়ে এল দারোয়ান রামভুজ সিং। এখন আর লাঠি নেই তার হাতে। নীরবে এসে রামভুজ এই মৌন শোভাযাত্রায় তৃতীয় স্থান গ্রহণ করলে।

এগিয়ে এল এরা তিন শোভাযাত্রী ধীর পদক্ষেপে। অগ্রে অগ্রে গৈরিকধারী, মাঝখানে ধুতি-পাঞ্জাবি-পরিহিত শৌখিন ভদ্রলোক, সব পিছনে মালকোঁচা-মারা ভোজপুরি! গেটের গায়ে ছোট্ট দরজা খুলে গেল একটা, সেই পথে গেট পার হয়ে এল তিনজনে। সশস্ত্র সান্ত্রী ধীর-পদক্ষেপে টহল দিচ্ছে সেখানে সঙ্গীন উঁচিয়ে! তার গা ঘেঁষেই বেরিয়ে এল এরা একে, একে, একে! সান্ত্রী এদের কোনো প্রশ্ন করলে না, তাকিয়ে দেখলে না পর্যন্ত এদের দিকে, তিনটে লোক যে তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে—এ হুঁশও যেন নেই তার!

তোরণ-পারে রাজপথে উঠল নিশিথ-রজনীর তিনটি যাত্রী! অগ্রে-অগ্রে গৈরিকধারী—তার পিছনে বাবু—তার পিছনে দারোয়ান! একশো আটের ভিতর আরও দুটি বলি সংগ্রহ করে পাতালপুরীতে ফিরে চলেছেন গৈরিকধারী সাধক!

গুড়ুম!

রাইফেল গর্জে উঠল কোথা থেকে যেন। দড়াম করে গড়িয়ে পড়ল পথের উপরে—নিশীথ রাতের গৈরিকধারী পথিক! একখানা পা তার একেবারে গুঁড়ো হয়ে গেছে।

"মা, মা!" করে পর পর আর্তনাদ উঠল তিনটি লোকেরই মুখ থেকে। প্রথম আর্তনাদ সন্ন্যাসীর, দ্বিতীয়টি প্রতাপ রায়ের, তৃতীয়টি দারোয়ান রামভুজের!

"ক্যা হুয়া" বলে সান্ত্রী ছুটে এল গেটের ওপার থেকে! জমিদারবাড়ির নীচে থেকে চারতলা পর্যন্ত সারি সারি বাতায়ন খুলে গেল এক একটি করে, তা দিয়ে বেরিয়ে এল, আলোর বন্যা এবং ভয়ার্ত দৃষ্টির ব্যাকুল জিজ্ঞাসা! রানিমার আর্ত চিৎকার ধ্বনিত হয়ে উঠল—"ওরে, রাজাবাবু কোথায়? দেখ, দেখ!"

ওদিকে রাস্তার ওপার থেকে বেরিয়ে এসেছে দলে দলে পুলিশ। বাড়ির আড়াল থেকে, ঝোপের পিছন থেকে তারা সবাই এল বন্দুক আর লাঠি উঁচিয়ে। গোটা রাজ-বাড়িটাই চারদিক থেকে ঘিরে বসে আছে তারা, সেই সন্ধ্যা থেকে!

রণদা এল! সুব্রতবাবু এলেন! অধীর উত্তেজনায় টর্চ ফেললে রণদা গৈরিকধারীর মুখের উপর। যাঃ। সব আশায় ছাই পড়ল তার! এ তো, ঠাকুর নন!

নাঃ, এ সে ঠাকুর নন! টকটকে যাঁর গায়ের রং, কুচকুচে যাঁর চাপ-দাড়ি, ধবধবে যাঁর লম্বিত উপবীত....এ তিনি নন, যিনি সর্ব নাটের গুরু, যিনি একশো আট নরবলি দিয়ে ধরায় দুঃখ-দৈন্য জরা-মৃত্যু চিরতরে দূর করে দেবার একাগ্র সাধনায় ব্রতী!

এ সেই গৌরকান্তি সন্ন্যাসী-যুবা—যে পাতালপুরীতে একবার দেখা দিয়েছিল, রণদার হাত-পায়ের বন্ধন খুলে দেবারর জন্যে। "নমস্কার সাধুজি"—তিক্তস্বরে বলে উঠল রণদা! "গুরুজিকে রেখে এলেন কোথায়?"

কোনো উত্তর নেই। পায়ের হাড় গুঁড়ো হয়ে গেছে ঠাকুরের, দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরেছেন তিনি যন্ত্রণায়। কিন্তু মুখে কোনো কাতরোক্তি নেই তাঁর, বা নেই কোনো অনুযোগ বা কৈফিয়ৎ বা অভিসম্পাত!

আর, রাজাবাবু আর তাঁর দারোয়ান সমস্বরে ক্রন্দন করছেন—"মা, মা, মাগো!" বলে, মাতৃহারা কচি ছেলের মতো। এ রকমটা দেখলে এখন রাগ হয় রণদার। নিজের অন্তরে যার দুর্বলতা নেই, সে কি কখনো এত সহজে মায়াবীর যাদুমন্ত্রে এমন অভিভূত হয়ে পড়ে! আর যে দুর্বল, তার মরণ তো পদে পদে!

ঠাকুরকে পরানো হল হাতকড়ি। পা ভেঙে বসে আছেন, কাজেই বেড়ি পরানো আর চলল না। তার পরিবর্তে কোমরে দড়ি বেঁধে গাড়িতে তোলা হল তাঁকে। গাড়ি ছুটল হাসপাতালের দিকে।

ভিতর থেকে রানি ছুটে এসেছেন ততক্ষণ....আলুথালু পাগলিনীর মতো। স্বামীর বুকের উপর পড়ে কী তাঁর কান্না! কিন্তু হায়! কার জন্যে এ ক্রন্দন তাঁর? স্বামীর মন আজ পাষাণ! পার্থিবস্নেহ বা অনুরাগের কোনো অস্তিত্ব নেই আর সে অন্তরে! মুখে তাঁর 'মা-মা' করুণ কাকুতি! পত্নীকে তিনি ঠেলে ফেলে দিতে চাইছেন নিজের কাজ থেকে!

সুব্রতবাবু রানিকে সম্বোধন করে বললেন—"আপনার স্বামীকে আর এই দারোয়ানটাকে খুব সাবধানে রাখা দরকার। পারবেন? পুলিশ দিয়ে বাড়ি ঘিরে রাখা তো আর বারো মাস সম্ভব নয়। মায়াবী-সন্ন্যাসীদের গ্রাস থেকে এঁদের রক্ষা করবার ব্যবস্থা কি করতে পারবেন আপনি?"

রানি কী উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন এ প্রশ্নের, তা আর কেউ কোনোদিন জানবে না। কারণ, তিনি কথা বলবার পূর্বেই—আর্তস্বরে হর্ন দিতে দিতে ছুটে এল একখানা মোটর, এবং একেবারে সুব্রতবাবুর পায়ের কাছে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন যেন হতাশভাবে। গাড়িতে ছিলেন একজন পদস্থ পুলিশ অফিসার, তিনি সুব্রতকে একপাশে টেনে নিয়ে ঝড়ের বেগে কী যেন বলে গেলেন মিনিট দুই ধরে। শুনতে শুনতে সুব্রত টাল খেয়ে পড়ে যাবার মতো হলেন, মাথা ঘুরে। পিছনে ছিল রণদা, সে ধরে ফেললে তাঁকে।

ঊর্ধ্বশ্বাসে সেই মোটর ফিরে চলল আবার। এবার সুব্রত আর রণদাও আরোহী সে গাড়িতে। ওদিকে তাঁরা নির্দেশ দিয়ে এসেছেন, কড়া পুলিশ পাহারায় প্রতাপ রায় আর রামভুজ দারোয়ানকে সেই মুহূর্তেই স্থানান্তর করবার জন্যে। বাঁশজুড়ির জমিদার বাড়িতে রেখে আসা আর চলে না ওঁদের। যে-খবর শোনা গেছে, তারপর প্রেসিডেন্সি জেল ভিন্ন মা-কালীর অনুগৃহীতদের নিরাপদে রাখবার মতো দ্বিতীয় স্থান আর চোখে পড়ে না সুব্রতর।

ঝড়ের বেগে গাড়ি এসে পড়ল সুব্রতর বাড়িতে। এইখানেই এনে রাখা হয়েছিল সুহৃৎ আর তার স্ত্রীকে। রাস্তা থেকেই

থেকেই সুহৃদের স্ত্রীর বুকফাটা কান্না কানে আসতে লাগলো সুব্রতর। পা ভারী হয়ে উঠলো সুব্রত-রণদার, বাড়ীর ভিতরে ঢুকতে যেন সাহস হয় না আর।

অবশেষে, দোতলার ঘরে এসে পৌঁছলেন ওঁরা দু'জনে। দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে পড়লেন ওঁরা হতবাক্... মুহ্যমান! দু-তিনজন পুলিশ-অফিসার ইতিপূর্বেই উপস্থিত হয়েছেন সেখানে! তাঁরাও বিভীষিকাগ্রস্তের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, নিশ্চল ও নিস্তব্ধ!

ঘরের ভিতর রক্তের ঢেউ!

সুহৃদের ধড় আর মাথা পৃথক্ হয়ে প'ড়ে আছে!

মাথাটা করাত-চেরার মত আড়া-আড়ি দ্বিখণ্ডিত!

মা-কালীর একখানা ছোট বাঁধানো-পট খাড়া ক'রে রাখা হয়েছে মেজের উপরে। ধূপ জ্বালানো হয়েছিল এবং জবাফুলে মায়ের সংক্ষিপ্ত অর্চনাও হয়েছে, তার নানা-চিহ্নই পটের সমুখে রয়েছে!

দেয়ালের গায়ে অঙ্গার দিয়ে লেখা বড়-বড় অক্ষরে—"আজ অমাবস্যা নয়, তবু সুহৃদের বলিদান আজকেই সমাধা করতে হলো। এতে তার মহামুক্তির যদি কোনো বাধা হয়, সেজন্যে দায়ী তোমরা—রণদা ও সুব্রত! আমার কোনো অসুবিধা হবে না, মস্তিষ্ক-বস্তুটা শোধন ক'রে নিলেই এই মায়ের দোষ খণ্ডন হয়ে যাবে!"

ভূতের মতোই রণদা তাকালে দ্বিখণ্ডিত মাথার দিকে।

ঠিকই বটে! মাথার ঘিলু কুরে বার ক'রে নিয়েছে ঐ নরক-দূত!

টলতে-টলতে পাশের ঘরে এসে ব'সে পড়লো রণদা। এই দুর্জয় শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা, সামান্য মানুষের সাজে না। দ্বিধা-ভয়-সঙ্কোচের অতীত এই কাপালিক, অবারিত গতি এর সর্বত্র, মানুষকে অসহায় অজ্ঞান খেলার বস্তুতে পরিণত ক'রে ফেলা—এর খেয়াল-সাপেক্ষ শুধু কৃপা ক'রে এ যাকে উদ্ধার করতে চাইবে, তাকে ধ'রে রাখবার শক্তি নেই কারও। মানুষী-বুদ্ধি এবং দৈবী-শক্তি—দুটোরই অধিকারী এই দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক!

সন্ধ্যা থেকে প্রতাপ রায়ের বাড়ী ঘিরে ব'সে ছিল রণদা। চমৎকার আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিল সে। এইবার ফাঁদে ফেলা গিয়েছে ঠাকুরকে! পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা থেকে সে সহজেই অনুমান করতে পেরেছিল—প্রতাপ রায়কে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ঠাকুরের শুভাগমন হবেই আজ রাত্রে অনুমান তার মিথ্যা হয়নি, এবং আট-ঘাট বেঁধে রাখা হয়েছিল বলেই, প্রধান দোষী না হোক—তার সঙ্গী একজন আজ ধরা পড়েছে।

কিন্তু ঐ নগণ্য সঙ্গীকে ধরবার জন্যে যখন ওৎ পেতে বসেছিল রণদা, তখন এদিকে যে সর্ব্বনাশ হয়ে যাচ্ছিল তা কি ক'রে জানবে ও? চারদিকে সজাগ-সশস্ত্র প্রহরীর, কেউ কিছু জানতে পারেনি—বাড়ীর ভিতর কি হচ্ছে তাতে

সুহৃদের স্ত্রীর আগমনে ঝড় থেমে গিয়েছিল, ডাকিনীর দল নিরস্ত হয়ে ফিরছিল, আজ তিনিও পারলেন না স্বামীকে রক্ষা করতে! ঠাকুর আজ নতুন কোনো শক্তিতে শক্তিমান হয়ে এসেছিল নিশ্চয়!

সুব্রত প্রবেশ করলেন ধীরে-ধীরে। হাতে একখানা চিঠি। চিঠি—খামের ভিতর আঁটা; বললেন, "মায়ের পট সরাতে গিয়ে, তারই তলায় এই চিঠি পাওয়া গেছে। তোমার নাম খামের উপরে।"

বিস্ময়বোধ করবার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে রণদার। এখন হঠাৎ ঘরের ছাদ তার মাথায় ভেঙে পড়লেও সে বিস্ময়বোধ করবে না আর। খাম ছিঁড়ে সে চিঠি পড়তে লাগলো। বেশ জোরেই সুরু করলো পড়তে, যাতে সুব্রত শুনতে পান। চিঠিটা এইরকম:

রণদা!

"এই খামের ভিতর হিস্‌পানিয়া জাহাজের একখানা টিকিট রইলো। লণ্ডনের টিকিট—সেকেণ্ডক্লাস। পাসপোর্ট ইত্যাদি সবই যথাসময়ে পৌঁছবে তোমার কাছে। জাহাজ পরশু ছাড়ছে। তোমার যাওয়া চাই।

থেকে কোনো লাভ নেই রণদা! মনে কষ্ট পাবে শুধু। মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ হবেই। সে মঙ্গল-ইচ্ছাকে প্রসন্ন-মনে মেনে নেওয়ার মতো সুবুদ্ধি তোমার নেই যখন, তখন দেশত্যাগই বাঞ্ছনীয় তোমার পক্ষে।

জবাফুলের দৌত্য যদি একবার ব্যর্থ হয়, তবে

সে-লোকের উপর দ্বিতীয়বার আক্রমণ মায়ের নিষেধ আছে। তাইতেই তুমি নিরাপদ আছো এখনো। কিন্তু দয়াকে দুর্বলতা মনে করো না। শুম্ভাসুরনাশিনীর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার দুষ্প্রবৃত্তি যেন তোমার না হয়!"

—রুদ্রানন্দ

চিঠি পড়া শেষ ক'রে, একমিনিট চুপ ক'রে রইলো রণদা। তারপরে শুষ্কস্বরে বললে—"তবু ভালো! এতদিন পরে ঠাকুরের নাম পাওয়া গেল একটা!"

ঘড়িতে দুটো বাজলো টং-টং ক'রে। থম্-থম্ করছে বাড়ীখানা। বিজলী-আলো এমন বে-মানান লাগছে আজ! ঘুরঘুট্টি অন্ধকার হলেই যেন আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খেতো সেটা। চারদিকে যে-সব ডাকিনীর দল, হাড়বার-করা হাত-পা ছুঁড়ে তাণ্ডব-নৃত্যে নামবার জন্যে উন্মুখ হয়েও এই উজ্জ্বল-আলোর আতঙ্কে অলক্ষ্যে গা-ঢাকা দিয়ে আছে, অন্ধকার দেখতে পেলে সোল্লাসে বেরিয়ে এসে তারা রণদা-সুব্রতের মুণ্ডু দুটো ছিঁড়ে নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলতে পারতো এতক্ষণ! আর, তাহলেই হতো ভালো। পুরুষাকার এমন-ভাবে ধিক্কৃত হয়নি আর কোনোদিন। রুদ্রানন্দ যেন রণদার নাক-কান কেটে দিয়ে, উল্টো-গাধায় চড়িয়ে সহরের রাজপথে ছেড়ে দিয়েছে তাকে!

হ্যাঁ, হিস্পানিয়া জাহাজেতেই চড়বে সে! চেনা-মানুষের সমাজে মুখ দেখানো তার চলে না আর।

কিন্তু সুব্রত ব'লে উঠলেন—"আমার অবস্থা ভেবে দেখ রণদা! আমি পুলিশের কেষ্টো-বিষ্টু একজন, আমার নিজেরই বাড়ীতে আমারই ভাগ্নী-জামাই—উঃ! সুরমা মেয়েটার দশা ভাবো একবার! আমার মরণ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই!"

সুরমা কি ঘুমিয়ে পড়েছে? অনেকক্ষণ কান্না শোনা যায়নি তার। হঠাৎ···হঠাৎ···

সুহৃদের ধড় এখনও প'ড়ে আছে ঐ ঘরটায়! ওখানে পাহারায় রয়েছেন, অশনিবাবু আর কুঞ্জুবাবু! হঠাৎ ও-ঘর থেকে সুরমার উত্তেজিত উচ্চ-কণ্ঠস্বর শোনা যায় কেন? সুব্রত দ্রুত ছুটে গেলেন ঐদিকে। রণদাও অনুসরণ করলে তাঁর!

মা-কালীর পট এখনও দাঁড়িয়ে, ঘরের মাঝখানে। তারই সুমুখে হাঁটু গেড়ে বসেছে সুরমা। চীৎকার ক'রে বলছে—"যে আমার সর্ব্বনাশ করেছে, নরকস্থ হোক সে! নরকস্থ হোক! ব্যর্থ হোক তার সব সাধনা!"

বলতে-বলতে বুকে তীক্ষ্ণধার ছুরি বিঁধিয়ে দিয়ে মায়ের পায়ে লুটিয়ে পড়লো পতিহারা সতী!

আট

তিন-তিনটে সূত্র এসে গেছে পুলিশের হাতে। জেল-হাসপাতালে বন্দী এক গৈরিকধারী সন্ন্যাসী, হিস্‌পানিয়া জাহাজের টিকিট, এবং সামসেরডাঙ্গার পথে খোলার ঘর। একে-একে তিনটেই নেড়ে-চেড়ে দেখতে হবে।

প্রথম : সন্ন্যাসীঠাকুর। পা তাঁর কেটে ফেলতে হবে। এ-অবস্থায় তাঁর উপর বেশী চাপ দেওয়া সত্যিই চলে না, সত্যকথা বার করবার জন্যে। তবু যথাসম্ভব সকল-রকম প্রক্রিয়াই ক'রে দেখা হয়েছে, খবর কিছু বার হয়নি। ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকেন প্রভু। কিছুই যেন মনে পড়ছে না! হয় রুদ্রানন্দের ম্যাজিকে স্মৃতি লোপ হয়েছে এঁর, আর তা না হয় যদি, তবে স্বীকার করতেই হবে—অভিনয় করবার শক্তি এঁর অসাধারণ।

অবশেষে ট্রুথ সিরাম ইন্‌জেকসন করেও দেখা হলো। পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞানের চমকপ্রদ আবিষ্কার এই ওষুধ। সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তির দেহে এটা ইন্‌জেকসন ক'রে দিলে তার আর সত্য গোপন করবার ক্ষমতাই থাকে না। সেইজন্যেই এর নাম, ট্রুথ সিরাম, বা সত্যপ্রকাশক ওষুধ।

কিন্তু এটার প্রয়োগেও ফল কিছু হলো না। সত্যই

তাহলে সব-কিছু ভুলে গেছে লোকটা! রুদ্রানন্দের সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না কোনোমতেই! এ-লোকটা বন্দী হওয়ামাত্রই মন্ত্রবলে এর স্মৃতি লোপ ঘটিয়েছে!

দ্বিতীয়ত: সামসেরডাঙ্গার পথে, খোলার ঘর। সে-ঘর চেনে রণদা। বেলা আটটাতেই পুলিশ-বাহিনী ঘিরে ফেললে ও-অঞ্চলটা। সাদা-পোষাকের পুলিশ, পকেটে পিস্তল। নাম-না-জানা ঝাঁকড়া-গাছের তলায় রুদ্রানন্দের আবির্ভাব আজ হয় কিনা, তাই দেখবার জন্যে প্রতীক্ষায় রয়েছে তারা!

ঠাকুরের লগ্ন হলো বেলা নয়টা! পুলিশের ভয়ে ঠাকুর কি তাঁর নিত্যকার মৃগয়া বাদ দেবেন আজ? তা যদি দেন, তবে বুঝতে হবে তাঁর ভয় হয়েছে, এবং মুখে তাঁর যতই দম্ভ থাক্, অন্তরে দুর্বলতা তাঁর এখনো বর্ত্তমান।

ন'টা বেজে গেছে, সওয়া-ন'টাও বাজলো। কই? গাছতলা তো শূন্য! খোলার ঘরের ভিতর মেটে-হাঁড়ির স্তূপ তেমনি মাথা তুলে রয়েছে আজও! আশ-পাশের দোকানীরাও যেন কী একটা আভাস পেয়েছে এই রহস্যের! কাজ করতে-করতে মাথা তুলে তারা এক-এক পলক তাকিয়ে নিচ্ছে এইদিক্-পানে!

রণদা অধীর হয়ে উঠেছে! ন'টা-কুড়ি! ঠাকুর তাহলে ভয় পেয়ে গেছে, এবং সাবধান হয়েছে। এলো না আজ! বলি সংগ্রহ করতে বেরুবার সাহস তার হয়নি! সে টের

পেয়েছে—সাদা-পোষাকের পুলিশ, পঞ্চাশটা পিস্তল নিয়ে তার প্রতীক্ষায় আছে আজ আশে-পাশে!

ঠাকুর আসেনি, কিন্তু পথচারী ঐ ভদ্রলোকটি বাজারের থলে-হাতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন—ঝাঁকড়া-গাছটার কাছাকাছি এসে?

রণদা তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে! আজ আর চিঠির বাক্সের আড়াল থেকে নয়, পানের দোকানের আধেক-খোলা ঝাঁপের পিছন থেকে! বাজারের থলে হাতে ক'রে ফতুয়া-গায়ে আধাবয়সী ভদ্রলোকটি—ঠায় দাঁড়িয়ে গেছেন ফুটপাথের মাঝখানে। ঠিক যেন কথা কইছেন কার সঙ্গে, এইভাবে মুখ নড়ছে তাঁর! কিন্তু কেউ তো নাই তাঁর সুমুখে! হাওয়ার সঙ্গে কথা কইছেন নাকি ভদ্রলোক?

—গুড়ুম্! গুড়ুম্! গুড়ুম্!

পর-পর ছ'টা গুলি করলে রণদা সেই বিশেষ জায়গাটির হাওয়া লক্ষ্য ক'রে। একটা ক্রুদ্ধ গর্জন স্পষ্ট শোনা গেল! কে করলে গর্জ্জন? নিশ্চয়ই ঐ হতভম্ব আধাবয়সী লোকটি নন্! তিনি তো সভয়ে ছুটেছেন পিছন-পানে, ডাকাত বা গুণ্ডার আক্রমণ আশঙ্কা ক'রে! অবশ্য ছুটে বেশীদূর যেতে পারলেন না তিনি, সাদা-পোষাক-পরা জনৈক পুলিশের লোক কোথা থেকে এসে জাপটে ধরলে তাঁকে!

রণদা ছুটে এলো। সঙ্গে-সঙ্গে এলো আরও পঞ্চাশটা

লোক। গাছতলায় তাজা রক্ত! রক্তের ছড়া দিতে-দিতে অদৃশ্য রুদ্রানন্দ গিয়ে ঢুকেছেন ঐ খোলার ঘরে!

আবার গুড়ুম্···গুড়ুম্···গুম্!!! মেটে-হাঁড়িগুলি গুঁড়ো হয়ে ধূলোয় মিশে গেল। ঘরের কোণ থেকে পরিত্রাহি চীৎকার করছে এক বুড়ো আর এক বুড়ী। তাদেরই ঘর এটা! ঐ-সব হাঁড়ি, তাদেরই। ঐ বেচেই দিন-গুজরাণ করে তারা। হঠাৎ পুলিশ এসে তাদের হাঁড়ির উপর পিস্তল ছোঁড়ে কেন? হাঁউ-মাউ ক'রে কাঁদতে লাগলো তারা।

রণদা ভেবে পায় না যে, এ-বুড়োর উপর রুদ্রানন্দের কৃপাদৃষ্টি কেন হয়নি এতদিন? একি তাঁর দলের লোক?

হাঁড়ি-কলসীর গুঁড়ো সরানো হলো। তাজা রক্তের দাগ মেজেতে! একটা বিশেষ জায়গায় এসে সে-দাগ শেষ হয়ে গেছে। ঘরের মেজে আগাগোড়া চৌকো-টালিতে ঢাকা। যে-টালিখানির উপর শেষ-রক্তবিন্দু পড়েছে, তারই উপর লাঠি দিয়ে ঘা দিতে লাগলো রণদা।

নাঃ, ফাঁপা ব'লে তো মনে হয় না!

সুব্রত একটু দেরীতে পৌঁছেচেন। হুকুম দিলেন, মেজে খুঁড়ে ফেলতে। পাঁচ মিনিটের ভিতর চারখানা কোদাল চলতে লাগলো সবেগে। বুড়ো-বুড়ী ততক্ষণ পুলিশের হেফাজতে। তারা কিছু জানে না। সবে দু'হপ্তা আগে ভাড়া নিয়েছে এই ঘর।

ঘরের মালিক কে এক মাড়োয়ারী বাবু। বুড়ো

কোনোদিন চক্ষে দেখেনি তাঁকে। তার যা-কিছু কারবার, বাড়ীওয়ালার দরোয়ানের সাথে। সে-দরোয়ানকেও পাওয়া গেল বইকি। তার চাকরি, দু-বছর হলো। পর-পর অনেক ভাড়াটেই সে এ-ঘরে বসিয়েছে। কিন্তু, ঘরের মেজেতে সন্দেহজনক কিছু আছে, এ-কথা সে কারও কাছেই শোনেনি কেনোদিন।

এদিকে মেজেতে পাঁচ-হাত গভীর গর্ত্ত হয়ে গেছে ততক্ষণ। আর কোদাল চলে না এইবার। নীচে থেকে শব্দ হচ্ছে ঠং-ঠং, খন্-খন্ ঠঠং-ঠং। কোপানো বন্ধ ক'রে গর্ত্তের তলা থেকে ঝুরো-মাটি তুলে ফেলতে লাগলো খনকেরা। পুরু লোহার পাত বেরিয়ে পড়লো এইবার, ডাইনে-বাঁয়ে সুমুখে-পশ্চাতে চারদিকেই মাটির তলায় প্রসারিত সেই লোহার পাত। কতদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত, তা জানতে হ'লে সারা ঘরটাই হয়তো কুপিয়ে ফেলতে হবে।

আরও লোক···আরও কোদাল···অবিশ্রান্ত কাজ চলতে লাগলো।

* * * *

এদিকে পাতালপুরীতে রুদ্রানন্দ বড় সংশয়ে পড়েছেন। দু'শো বছরের দীর্ঘ জীবনে এই তাঁর প্রথম সংশয়! মায়ের দয়া কি তাঁর উপর থেকে চলে যাচ্ছে? জীবনের ব্রত—অমৃত-আবিষ্কার—সে-ব্রতের উদ্‌যাপন কি সম্ভব হবে না তাঁর দ্বারা?

রণদার পিস্তলের দুটো গুলি তাঁকে আহত করেছে। অদৃশ্য-লোককে এভাবে আঘাত করতে পারবে ছোকরা, এটা ঠাকুর ভাবতেই পারেন নি মোটে! কিন্তু অদ্ভুতকর্ম্মা ঐ রণদা। ঠাকুর তারিফ করেন ওর।

একটা গুলি তলপেটে লেগেছে, একটা বাঁ-হাতে। তা লাগুক, ওতে ঠাকুর ভয় পান না। নিজের হাতে ছুরি দিয়ে কেটে বার করেছেন গুলি দুটো। রক্ত পড়েছে অঝর-ঝোরে! তা পড়ুক। অমাবস্যা-রাত্রে তো রক্তের প্লাবন বয়ে যায় ঠাকুরের পায়ের তলায়। রক্তপাত তো রুদ্রানন্দের খেলা মাত্র। তা, সে-রক্ত অপরেরই হোক, আর নিজেরই হোক।

রুদ্রানন্দের নিজের আবিষ্কৃত ওষুধই আছে, রক্ত বন্ধ করবার, ক্ষত নিরাময় করবার। ক্ষতের উপর সেটা লেপন ক'রে দেওয়ামাত্র ঠাকুর সুস্থ হয়ে উঠলেন, বুলেটের আঘাত-জনিত কোনো গ্লানি বা বেদনা আর রইলো না তাঁর দেহে তখন তিনি চিন্তা করতে বসলেন।

কাল সুহৃদকে বলি দিতে হয়েছে চতুর্থী-তিথিতে, অস্থানে! অবশ্য, মা সর্ব্বত্রই আছেন, যথাশাস্ত্র বলিদান যদি সম্পন্ন হয়, স্থানের ইতর-বিশেষে কিছু যায়-আসে না। তিথিটা অশাস্ত্রীয় হয়েছে, কিন্তু তারও সংশোধনের উপায় জানা আছে ঠাকুরের। দেরী করা সম্ভব হলো না আর। সুহৃৎকে ওরা বহুদূরে পাঠিয়ে দেবার পরামর্শ আঁটছিল। দেবীর বলিকে

হাতছাড়া করতে পারেন না ঠাকুর, প্রাণান্তেও। শেষকালে একজনের জন্যে কামস্কাটকা, আর-একজনের জন্যে মরক্কোতে ছুটে বেড়াবেন নাকি ঠাকুর ?

হ্যাঁ, সুহৃদের ঝামেলা চট্‌পট্ সারতে হলো। বড় অসুবিধা ঘটিয়েছিল ঐ স্ত্রীলোকটি। তেজস্বিনী নারী! সতী-নারীকে রীতিমতো ভয় করেন রুদ্রানন্দ। তারা এক-এক সময় সব-কিছু আয়োজন পণ্ড ক'রে দিয়েছে তাঁর। ওরা রুখে দাঁড়ালে রুদ্রানন্দের মনে হয়—মা আর তাঁর স্বপক্ষে নন্, বিপক্ষে চলে গেছেন। তাই অপহৃত-সুহৃৎকে হাত-ছাড়া ক'রে একা চলে যেতে হয়েছিল ঠাকুরকে পরশু-রাত্রে। তাই বিশেষ একটা যজ্ঞ ক'রে অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করতে হয়েছিল কাল, যাতে সদা-জাগ্রতাময়ীর চক্ষুকে যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন ক'রে তার স্বামীকে বলি দেওয়া যায় অবিলম্বে।

কিন্তু পরাজিতা হয়েও ভীষণ বিপদে ফেলেছে ঠাকুরকে, ঐ সুরমা। কাল মায়ের পায়ে আত্মবলি দিয়েছে সে, শেষ-নিশ্বাসের সঙ্গে রুদ্রানন্দকে অভিসম্পাত ক'রে। নারীবলি একেবারে নিষিদ্ধ। মায়ের কঠোর আদেশ আছে—নারী-রক্তপাতে সাধকের সমস্ত তপোবল ভস্ম হয়ে যাবে। রুদ্রানন্দেরও কি সেই সর্বনাশ হলো ? তা নইলে তাঁর অদৃশ্য-দেহেও গুলির আঘাত লাগবে কি ক'রে ?

পুলিশ ওদিকে প্রতাপ রায়কে আর রামভুজ দরোয়ানকে

হাতছাড়া করতে পারেন না ঠাকুর, প্রাণান্তেও। শেষকালে একজনের জন্যে কামস্কাটকা, আর-একজনের জন্যে মরক্কোতে ছুটে বেড়াবেন নাকি ঠাকুর ?

হ্যাঁ, সুহৃদের ঝামেলা চট্‌পট্ সারতে হলো। বড় অসুবিধা ঘটিয়েছিল ঐ স্ত্রীলোকটি। তেজস্বিনী নারী! সতী-নারীকে রীতিমতো ভয় করেন রুদ্রানন্দ। তারা এক-এক সময় সব-কিছু আয়োজন পণ্ড ক'রে দিয়েছে তাঁর। ওরা রুখে দাঁড়ালে রুদ্রানন্দের মনে হয়—মা আর তাঁর স্বপক্ষে নন্, বিপক্ষে চলে গেছেন। তাই অপহৃত-সুহৃৎকে হাত-ছাড়া ক'রে একা চলে যেতে হয়েছিল ঠাকুরকে পরশু-রাত্রে। তাই বিশেষ একটা যজ্ঞ ক'রে অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করতে হয়েছিল কাল, যাতে সদা-জাগ্রতাময়ীর চক্ষুকে যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন ক'রে তার স্বামীকে বলি দেওয়া যায় অবিলম্বে।

কিন্তু পরাজিতা হয়েও ভীষণ বিপদে ফেলেছে ঠাকুরকে, ঐ সুরমা। কাল মায়ের পায়ে আত্মবলি দিয়েছে সে, শেষ-নিশ্বাসের সঙ্গে রুদ্রানন্দকে অভিসম্পাত ক'রে। নারীবলি একেবারে নিষিদ্ধ। মায়ের কঠোর আদেশ আছে—নারী-রক্তপাতে সাধকের সমস্ত তপোবল ভস্ম হয়ে যাবে। রুদ্রানন্দেরও কি সেই সর্বনাশ হলো ? তা নইলে তাঁর অদৃশ্য-দেহেও গুলির আঘাত লাগবে কি ক'রে ?

পুলিশ ওদিকে প্রতাপ রায়কে আর রামভুজ দরোয়ানকে

আটক করে ফেলেছে, বাড়িতেও রাখেনি তাদের। একেবারে প্রেসিডেন্সি জেলের ভিতর লুকিয়েছে ওদের। স্বাভাবিক অবস্থায় সেখান থেকেই হয়তো ঠাকুর ওদের বার করে আনতে পারতেন, কিন্তু আজ নিজের অন্তরেই দুর্বলতা এসেছে, কোনো কিছু কাজেই অগ্রসর হতে ভয় পাচ্ছেন তিনি।

ওদিকে মূর্খ যোগজীবন পুলিশের হাতে। তার অবশ্য স্মৃতি লোপ করে দিয়েছেন ঠাকুর, কোনো অনিষ্ট আর তার দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু একটা বিশ্বাসী অনুচরের তো প্রয়োজন হয় লোকের। ঠাকুরের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করবার একটি লোকও রইল না আর!

ওকি! তুমুল ঝনঝনা উঠছে মাথার ওপরে! গুপ্তসুড়ঙ্গের অস্তিত্ব ধরে ফেলেছে পুলিশ। অবশ্য, সুড়ঙ্গ-মুখের লৌহাবরণ অপসারিত করার কৌশল তারা জানে না। জানবার সম্ভাবনা নেই কোনোদিনই। আর, গায়ের জোরে ঐ এক ফুট মোটা নিরেট-লোহার ঢাকনা ভেঙে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করা—হ্যাঁ, কামান দাগলে হতে পারে হয়তো।

যাই হোক, অর্ধসহস্র বৎসরের পুরাতন এই পাতালকালীর পীঠস্থান শত্রু-পদস্পর্শে কলঙ্কিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এ স্থান সাময়িকভাবে ত্যাগ করাই বোধহয় সঙ্গত। কিন্তু এ-সব লট-বহর নিয়ে যাওয়া যায় কোথায়? গোটা-কুড়ি বলির পশু সংগ্রহ হয়ে আছে—অর্থাৎ দ্বিপদ নরপশু। তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া কি সম্ভব?—নাঃ! যেতে হলে ওদের বলিদান দিয়েই যেতে হয়। এবং—তা অবিলম্বে। গত-অমাবস্যায় নিহত সাতাশটা লোকের শব এখনও গর্তে পড়ে আছে, গন্ধকের আরকে ভেজানো রয়েছে অবশ্য। দু-চারটে নিশ্চিহ্ন হয়ে গলে গেছে হয়তো, কিন্তু অনেকগুলোরই দেহাবশেষ এখনো কিছু কিছু বজায় আছে, সম্পূর্ণ গলে যেতে আরও দু-একদিন নেবে।

কিন্তু আজ যদি আবার কুড়িটা নরদেহ গন্ধকের আরকে নিক্ষিপ্ত হয়, তা তো প্রায়-অবিকৃত-অবস্থায়ই পুলিশের চোখে পড়বে। অর্থাৎ, পুলিশ যদি কামান দিয়েই পথ পরিষ্কার করে পাতাল-পুরে প্রবেশ করে—তখন?

হঠাৎ ঠাকুর হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন। কামানের গোলা কি পথ পরিষ্কার করে দিয়ে ক্ষান্ত হবে? হাঃ হাঃ হাঃ। পাতালপুরীর ছাদও ধসে পড়বে যে। বিধ্বস্ত সুড়ঙ্গ খুঁড়ে রুদ্রানন্দের ক্রিয়াকলাপের চিহ্ন আবিষ্কার—সময়সাপেক্ষ।

তবে তাই। সংগৃহীত নরপশুদের বলিদান আজ রাত্রেই সমাধা করা চাই। আজ রাত্রেই এ-পুরী ত্যাগ করে চলে যাওয়া চাই—আদিগঙ্গার তীরবর্তী সুড়ঙ্গপথ দিয়ে! ঠাকুর একা হলে মাথার উপরের রাস্তা দিয়েই বেরিয়ে যেতে পারতেন, কারণ, লোহা বা মাটি বা ইটের দেয়াল—সব-কিছুরই ভিতর দিয়ে স্থূল-দেহ নিয়ে যাতায়াতের শক্তি তাঁর আছে। যোগসিদ্ধ পুরুষের কাছে ওটা তো শক্ত নয় মোটেই!

কিন্তু ঠাকুর একা নন, ভৈরব-কাপালিক আছে, তার ভাই ঈশান আছে—যার কাজ হচ্ছে, প্রতি অমাবস্যায় নরবলি দেওয়া। ঐ দুটো মানুষ যাবে, এবং তারা মাথায় করে নিয়ে যাবে মায়ের মূর্তি আর অমৃত জ্বাল-দেওয়ার সমস্ত সরঞ্জাম। আদিগঙ্গার পথেই নিষ্ক্রান্ত হওয়া দরকার। সৌভাগ্যক্রমে পুলিশ এখনো সে-দিকটায় হানা দিতে পারেনি।

দাঁড়াও! আর একটা সমস্যা রয়েছে। প্রতাপ রায়ের ছেলে এখানে বন্দী...মায়ের চরণে আত্মোৎসর্গের জন্যে সে ব্যাকুল। ওদিকে প্রতাপ রায়ের উপরও মায়ের কৃপা হয়েছে। এখন পিতা-পুত্রের ভিতর কাকে ছেড়ে কাকে রাখা যায়? পিতা-পুত্রকে একসাথে বলি দেওয়া মায়ের নিষেধ! এবং পিতার উপর মায়ের দৃষ্টি যেখানে পতিত হয়েছে, সেখানে পুত্রকে বলি দেওয়া অশাস্ত্রীয়! তবে?

প্রতাপ হাতের বাইরে এখনো! কিন্তু হাতের বাইরে রয়েছে বলেই প্রতাপের উপর থেকে দাবি তুলে নিতে হবে না-কী? কখনো না! মায়ের অলঙ্ঘ্য আদেশ! প্রতি-প্রাতে মায়ের পূজা সাঙ্গ করে বহির্জগতের যে-লোকটির সঙ্গে প্রথম চোখোচোখি সাক্ষাৎ হবে রুদ্রানন্দ ঠাকুরের, মা তাকে বলির জন্যে মনোনীত করেছেন—ধরে নিতে হবে। চুয়ান্নটা বলি যা দেওয়া হয়েছে এই পাতালপুরীতে—তার প্রত্যেকটি জীবকে মা এইভাবেই মনোনীত করেছেন। এইভাবে মনোনীত হয়েছিল বলেই সুহৃৎকে বলি দেওয়া হয়েছে, সুব্রতের বাড়িতে চড়াও হয়ে। অথচ, এইভাবে মনোনীত প্রতাপ রায়কে বলির তালিকা থেকে বাতিল করে দিতে হবে, শুধু পুলিশ তাকে আগলে রয়েছে বলে? ধিক্! পুলিশের শাসন কি মায়ের ইচ্ছাকে লঙ্ঘন করবে? রুদ্রানন্দ বেঁচে থাকতে নয়!

নয়

সামসেরডাঙ্গার রাস্তায় পুলিশের বি
একটা গোটা বস্তী উৎখাত ক'রে
বাসিন্দারা সরকারী-লরীতে চ'ড়ে শহরের
চালান হয়ে গেছে—ছেলে-পুলে, মোট-ঘাট, হাঁড়ি
যেখানে-যেখানে সরকারী-বাড়ী খালি আছে, সেখচয়ে নিলে
করবে ওরা এখনকার মতো।
ব, ছয়জন

খোলার ঘর দুশো খানা অন্তত ভেঙে উড়িয়েও কাউকে পুলিশ। চিহ্নমাত্র নেই আর সে-সব ঘরের। পাতাল-খোলা, দেয়াল ও ভিতের মাটি, দরজা-জানলার চৌকাঠ কবাট—সব-কিছুই বড়-বড় ট্রাক বোঝাই হয়ে তাঁতীর বাগানে মজুদ হয়েছে গিয়ে। সন্ধ্যার আঁধার যখন ঘনিয়ে এলো, প্রায় এক-একর জমিতে পাঁচ-হাত গভীর একটা পুকুর তৈরী হয়েছে। সারাদিন প্রায় পাঁচশো লোক কাজ করেছে ওখানে কোদাল আর ঝুড়ি নিয়ে। অবশ্য, কৌতূহলী দর্শকের প্রবেশ নিষেধ সেখানে। বিশেষ ক'রে, খবর-কাগজের রিপোর্টারদের।

পাঁচ-হাত গভীর সেই পুকুরের তলা আগাগোড়া লোহার পাতে ঢাকা। উপরে ঝন্-ঝন্ শব্দে মুগুর মেরেছে পুলিশ, কই, ফাঁপা আওয়াজ কোথাও পাওয়া যায় না তো! বিশেষজ্ঞেরা বলছেন—"নীচে হয়তো ফাঁকা জায়গা থাকতেও পারে

ধ'রে নিতে হবে। চুয়াহার ছাদ এমন পুরু যে, স্রেফ্ পাতাল-পুরীতে—তার সে ফাঁকা জায়গা নির্ণয় করা সম্ভব মনোনীত করেছেন।

সুহৃৎকে বলি দে জমি জুড়ে রয়েছে ঐ লোহার আবরণ। হয়ে। অথচ, মানা পাওয়া গিয়েছে বই-কি! চারদিকেই তালিকা থেকে দেয়াল নেমে গিয়েছে পাতাল-পানে! খুঁড়তে আগলে রয়ে অনন্তকাল ধ'রে···যতদিন-না এই দেয়ালের ভিৎ মায়ের ইচ্ছ ছাতে পারো!

শের ছাউনি পড়েছে। একটা ছোট্ট তাঁবুর ভিতর সে আছে, স্তূপাকার কাগজ-পত্র নিয়ে। এগুলো যার থেকে আনিয়েছে সে। সবই ম্যাপ। কলকাতার ভিন্ন শহরতলীর সীমা, শহরের রাস্তা-ঘাট-খাল-বিল-নদী-জঙ্গল সবই বিশদভাবে দেখানো আছে এই-সব ম্যাপে।

সামসেরডাঙ্গার উত্তর-মাথায় আদিগঙ্গা, পূবে নোনা বিল। দক্ষিণে-পশ্চিমে জনবহুল পল্লী।

কিন্তু কথা এই—রণদা খোঁজে কি?

খোঁজে—এই পাতাল-পুরীতে ঢোকবার রাস্তা।

পাঁচ-হাত মাটির তলায় লোহার আবরণ। এ-সব ভেদ ক'রে পাতাল-পুরীতে নেমে-যাওয়া, বা এ-সব ভেদ ক'রে পাতাল-পুরী থেকে কলকাতা শহরের দিবালোকে উঠে-আসা, রুদ্রানন্দের পক্ষে সম্ভব হতে পারে। কিন্তু অন্য লোকের জন্যে যাতায়াতের একটা পথ থাকবে তো! অন্য-লোকও

আছে সেখানে। বন্দীরা আছে, আর যে-সন্ন্যাসী ধরা পড়ে সেও ছিল!

তাহলে, রাস্তা যদি থাকে, তবে সেটা কোথায়, কোন্ দিকে, কতদূরে থাকা সম্ভব? নিরিবিলি-জায়গায় যে হবে সে রাস্তার মুখ, তাতে সন্দেহ নেই। পল্লীর ভিতরে হওয়ার চাইতে, আদিগঙ্গা বা নোনা-বিলের দিকে হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী ব'লে মনে হয় রণদার।

সুব্রতের কাছে একডজন অস্ত্রধারী পুলিশ চেয়ে নিলে রণদা। ছয়জন নোনা-বিলের কূলে-কূলে টহল দেবে, ছয়জন আদিগঙ্গার তীরে-তীরে। সন্দেহজনক লোক কোথাও কাউকে দেখলেই ধরবে তারা। যে-রকম উৎপাত চলেছে পাতাল-পুরীর ছাদের উপর, তাতে, রুদ্রানন্দ যদি দেবতা বা পিশাচ না হন্, তাহলে স্থানত্যাগের জন্যে একটা আকাঙ্ক্ষা হওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক।

রাত্রি দশটা-আন্দাজ রণদা নোনা-বিলের দিকে রওনা হলো; সুব্রত রওনা হলেন, আদিগঙ্গার দিকে। প্রত্যেকের সঙ্গে ছয়জন লোক।

* * * *

পাতাল-পুরীর ল্যাবরেটরিতে উনিশটা মাথা সারি-সারি সাজানো। রুদ্রানন্দ প্রত্যেকটা থেকে ঘিলু বার ক'রে কাচের টিউবে ভরছেন। এখনো অন্তত তিনঘণ্টার কাজ বাকী আছে তাঁর। রাত্রি ওদিকে বারোটা। আজ রাত্রির

ধ'রে পাতাল-পুরী ত্যাগ করতে হবেই। বলি শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই মায়ের বিগ্রহ মাথায় ক'রে ঈশান বেরিয়ে চলে গেছে উত্তরের সুড়ঙ্গ-পথে। আদিগঙ্গা-তীরের পরিত্যক্ত মন্দিরে বিগ্রহ রেখে সে ফিরে আসবে। এসে ভৈরবের সাহায্য করবে লটবহর নিয়ে যাওয়ার জন্যে। ভৈরব ততক্ষণ জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলুক।

রাত্রি একটা-নাগাদ ঈশান ফিরে এলো। ঠিক ভৈরবেরই মতো বিকট চেহারা এরও। সহোদর ভাই দু'জনে।

ঠাকুর তখন সবে স্পিরিট-ল্যাম্প জেলেছেন, কাচের নলের তলায় জ্বাল দেবার জন্যে। ঈশান কালো মুখ আরো কালো ক'রে এসে ডাকলে তাঁকে—"দেবতা!"

ঠাকুর মুখ তুলে তাকালেন।

—"দেবতা! মাকে তো রেখে এসেছি ভাঙা-মন্দিরে! কিন্তু ওদিকে লোক ঘুরছে, দেখে এলাম!"

—"লোক?—" ঠাকুরের মুখে ভ্রূকুটি দেখা দিলে।

—"পাঁচ-ছ'টা লোক! পুলিশ ব'লে মনে হলো! গাঙের কূল বেয়ে যাচ্ছে-আসছে। মন্দিরের পাশ দিয়েই চলে গেল। একটা হিন্দুস্থানী মন্দিরে ঢুকে দেখবার কথা তুলেও ছিল। কিন্তু বাঙালী-একজন তাকে নিষেধ করলে, বললে—'পরে দেখবো-এখন, আগে সবটা এলাকা ঘুরে আসি একবার!'

ঠাকুর কী যেন চিন্তা করলেন। নিজের মনেই ব'লে

উঠলেন বিরক্তভাবে—"ঐ রণদা। বাঙালী যখন, তখন রণদা ছাড়া আর কে হবে? ঐ ছোকরা আমার শনি! অথচ মায়ের কী দয়া যে ওর উপর! জবাফুল পাঠিয়েও ওকে খতম ক'রে উঠতে পারিনি যখন—গেরো দেখ না, মারা পড়লো একটা নির্দ্দোষী চাকর!"

ঠাকুর, ভৈরবকে ডাকলেন।

* * * *

সূর্য্য ওঠবার পরে রণদা ফিরলো সঙ্গীদের নিয়ে। সারা-রাত্রি নোনা-বিলের ধারে-ধারে খালে-জঙ্গলে ঘুরেছে ওরা। একটা সাপ মেরেছে, তাছাড়া হিংস্র জীব কারো সঙ্গে ওদের সাক্ষাৎ হয়নি।

ওরা ফিরলো, কিন্তু সুব্রতের পার্টি তো আসে না! কী হলো ওদের?

বেলা আটটায় সন্ধ্যানী-দল বেরুলো আদিগঙ্গার দিকে। রণদার দেহ চলছে না বটে, কিন্তু যেতেই হলো তাকে। সুব্রতের বিপদ ঘটেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

অবশ্য, বিপদ যদি ঘটে থাকে, শত্রুর হাতেই ঘটেছে, তাহলে তো পাতাল-পুরীর গুপ্তপথ, ওইদিকেই হওয়া অনিবার্য্য।

অবশেষে বেলা প্রায় দশটায় সন্ধান পাওয়া গেল।

অতি নিরালা জায়গা! আদিগঙ্গার মরা-খাতের উপরেই খানিকটা নিবিড় জঙ্গল। তার ভিতরে বারো আনা আত্ম-

গোপন ক'রে আছে এক ভগ্ন-মন্দির। একফালি সুঁড়ি রাস্তা নদীর খাত থেকে উঠে এঁকে-বেঁকে চলে গেছে মন্দিরের দিকে। আর-সবদিকেই অভেদ্য জঙ্গল।

অল্প দূরেই নদীর ওপারে এক-ঘর কাঠুরের বসতি। তাদের মুখে শোনা গেল—এক কাপালিক সন্ন্যাসীকে মাঝে-মাঝে দেখা যায়, ঐ মন্দিরে। তাঁরই চলাচলের ফলে ঐ সুঁড়ি-রাস্তার উৎপত্তি হয়েছে ওখানে।

নদীর খাতে নেমে ঐ সুঁড়ি-পথ বেয়ে রণদা জঙ্গলে ঢুকলো। তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ জঙ্গলের ভিতরেই পাতাল-পুরীর সুড়ঙ্গ-মুখ দেখতে পাওয়া যাবে, এবং খুবই সম্ভব, সুব্রত সানুচর বন্দী হয়েছেন সেই পাতাল-পুরীতেই।

এক-একজন ক'রে সাবধানে চলতে হয় ওই সুঁড়ি-পথে। দু'ধার থেকে লতা-পাতা গাছের ডাল এসে মাথায় গায়ে ঝাপ্‌টা মেরে যাচ্ছে। ওদের সঙ্গে দু'একটা কেউটে সাপও এসে স্নেহসম্ভাষণ জানিয়ে যায় যদি—তবেই তো চক্ষুস্থির!

কেউটের দরুণ না হোক, চক্ষুস্থির হবার অন্য কারণ অচিরেই ঘটলো। মন্দিরের গায়ে ভাঙা সিঁড়ি। সেই সিঁড়ির উপরে-নীচে এবং দরজার চৌকাঠে একগাদা নরদেহ প'ড়ে আছে। জঙ্গলের ভিতরেও অন্তত দশ হাত জায়গা পঙ্কিল হয়ে রয়েছে জমাট রক্ত!

কারও মুণ্ডুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ধড় থেকে, কারও

কাঁধের উপর থেকে পৈতের মতো নেমে এসেছে খাঁড়ার কোপ। কারও-বা কোমরের মাঝামাঝি চোট লেগে প্রায় দু'খণ্ড হয়ে গেছে দেহটা!

এরা-সব পুলিশের লোক! সুব্রতের সঙ্গী হয়েছিল এরাই গত-রাত্রিতে!

কিন্তু, সুব্রত কই?

এবং ঐ দুষমণ-চেহারা ভীষণ কালো মহিষাসুরের মতো লোকটা কে? ও প'ড়ে আছে একেবারে মন্দিরের ভিতরে, হাতের বজ্রমুষ্টিতে এখনো ওর রক্তে-রাঙা বিরাট খাঁড়া!

রণদা একে চেনে না। এ সেই ঈশান কামার! অগুন্তি নরবলি নিজের হাতে দিয়ে, মরবার মুহূর্তে ছ'টা মানুষকে হত্যা ক'রে গেছে একসাথে! বুকে এর বুলেট বিঁধেছে। সুব্রতের গুলি নিশ্চয়। কিন্তু, সুব্রত কই?

সুব্রত কোথাও নেই!

সারা মন্দির পাঁতি-পাঁতি ক'রে খুঁজলে এরা। নিবিড় জঙ্গলের চারদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন ক'রে-ক'রে দেখলে—কোথাও কোনো মৃতদেহ প'ড়ে নেই। তাহলে কি সুব্রতকে বন্দী ক'রে পাতাল-পুরে, বা অন্য কোথাও নিয়ে গেল রুদ্রানন্দ-ঠাকুর? বন্দীই-বা করবে কেন? কোনোদিন সকাল নয়টায় তো রুদ্রানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি ভদ্রলোকের।

মন্দিরের ভিতরটা খুব অপরিচ্ছন্ন নয়। রুদ্রানন্দ এবং তাঁর অনুচরদের হামেসাই যাতায়াত আছে এখানে, এটা সহজেই

বোঝা যায়। কিন্তু সুড়ঙ্গ-পথ কই? পাতাল-পুরীর প্রবেশ-দ্বার কোথায়?

মন্দিরে বিগ্রহ নেই, কিন্তু বেদী আছে। রণদা, দেবীর দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগলো। মেজের উপর যেখানে বেদী গাঁথা রয়েছে, সেই সন্ধি-স্থানে সূক্ষ্ম একটা চির্ যেন দেখতে পাওয়া যায়! কনস্টেবলদের বললে রণদা—ঐ বেদী ধ'রে নাড়া দেবার জন্যে।

দু'তিন জন লোকে প্রবলবেগে আক্রমণ করবার সঙ্গে-সঙ্গেই বেদী একেবারে স্থানচ্যুত হয়ে স'রে এলো, কনস্টেবলদের বাহু বেষ্টনের মাঝখানে। একটা গভীর কূপ। অবশ্য, অন্ধকার নয়, নীচে পর্য্যন্ত ঝক্‌ঝক করছে উজ্জ্বল আলোতে! কূপের গায়ে বড়-বড় আংটা বসানো!

দশজন লোক ছিল রণদার সঙ্গে। একজনকে পাঠানো হলো, লালবাজারে। দু'জন রইলো মন্দিরেই পাহারা। আর সাতজন লোক নিয়ে রণদা আংটা ধ'রে-ধ'রে কূপের ভিতর নেমে গেল।

রণদার কঠোর আদেশ, সুড়ঙ্গের ভিতর গেরুয়াধারী কাউকে দেখলেই তৎক্ষণাৎ গুলি করবে। প্রত্যেকের হাতে গুলিভরা বন্দুক।

সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ ক্রমশ নীচে নেমে চলেছে। খুব বেশী ঢালু নয়, হাঁটতে কষ্ট হয় না। মাঝে-মাঝে দশ-বারোটা ক'রে এক-এক-থাক সিঁড়ি। সেটা বেয়ে নামলেই

আবার খানিকটা ক'রে প্রায় সমতল রাস্তা। সে রাস্তা খাদরি-ইটের গাঁথনি, এবং পরিচ্ছন্নভাবে ঝাঁট দেওয়া। সুড়ঙ্গের ছাদে মাঝে-মাঝে বিজলী-আলো। এ আবার আর-একটা সমস্যা! এই বিজলী-প্রবাহ কোথা থেকে পান রুদ্রানন্দঠাকুর? চোরাই-প্রবাহ যদি হয়, কোথা থেকেই-বা চুরি হয়? এ-সব লাইন মেরামত করে কে? রুদ্রানন্দের দলে সমাজের বিভিন্ন-স্তরের লোক আছে তাহলে! অমৃত-পানের আকাঙ্ক্ষায় কেই-বা অধীর না হবে?

অবশেষে সুড়ঙ্গ শেষ হলো। বিজলী-আলো সত্ত্বেও প্রশস্ত-চত্বরে কোনো-কোনো স্থানে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার অটুট হয়ে রয়েছে। চত্বরের শেষপ্রান্তে অনতি-বৃহৎ পাষাণ-মন্দির, চারদি:ব। খোলা। মাঝখানে বেদী, সে-বেদীতে আজ আর বিপারে নেই। মন্দিরের ঠিক সুমুখে রক্তমাখা টকটকে লা- বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড। তার আশে-পাশে জমাট রক্তাও নিশ্চয় করছে এখনো। -একটা নির্ভয়েই

ও-ধারে এক বৃহৎ চৌবাচ্চায় প্রায় একজ রণদা! পিছনে নরদেহ। একটা তীব্র-গন্ধী জলীয় পদার্থেজন সিপাই নীচের দেহগুলি। কোনো ধড়ের হাত, (কোনোটার-বা গায়ের চামড়া ইতিমধ্যে:চ্ছে ওরা। বাঁয়ে গন্ধকের আরকে। আজকের দিনটা কেকালীর বাঁধানো-পট দেহের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। সুমুখেই বন্দীদের

রক্ত-ভরা একটা চৌবাচ্চা টগ্‌বগ্ ক'রে ফুটজে সে-সব বন্দী···

জলের মতো। এও ঐ গন্ধকের ক্রিয়া! খানিকটা জল ছাড়া ও-চৌবাচ্চায় কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না কাল।

চারদিকের এই বীভৎস দৃশ্য দেখে কনষ্টেবলরা প্রায় সকলেই অবসন্ন হয়ে ব'সে পড়লো মাথায় হাত দিয়ে। এ কি—প্রেত-পুরী? এত লোক একসাথে রয়েছে ওরা, তবু যেন ভয় করছে ভীষণ! যেন দম আটকে আসছে এই বিষাক্ত বদ্ধ-বায়ুতে!

রণদা ওদের নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগলো। কখানিকট জায়গা দারুণ অন্ধকার। পকেটে কাল রাত্রি থেকেই কূর্পচ রয়েছে রণদার। সেই টর্চের আলোয় সন্তর্পণে অগ্রসর আলো ওরা। ধীরে—ধীরে—ধীরে!

দশজই হলো রুদ্রানন্দঠাকুরের ল্যাবরেটরি। মাঝা-মাঝি হলো, লালং একঝুড়ি নরমুণ্ড প'ড়ে আছে এখনো। এগুলি সাতজন লোক ফেলবার সময় হয়নি ওদের। অথবা হয়তো নেমে গেল। য় ভুলে গিয়েছিল এর কথা। এ-ঝুড়িগুলো রণদার কঠোর । মাথার খুলির উপর থেকে চামড়া ছাড়িয়ে কাউকে দেখলেই তৎক্ষণ মুখের উপর থেকে নেয়নি। ফটো গুলিভরা বন্দুক। লের। হয়তো হদিশ পাওয়া সম্ভব হবে

সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ ান্ ভাগ্যবান, মায়ের পায়ে দেহ উৎসর্গ ঢালু নয়, হাঁটতে াভ করেছে গত-রাত্রে। ক'রে এক-এক- পার হয়ে আরও দুটে ঘর। তারপর

সিঁড়ি। এ-সিঁড়ি, চেনে রণদা। সিঁড়ি বেয়ে উঠে ডান-দিকে একখানা ঘর। সে-ঘরে এখনো সোফা সাজানো রয়েছে, এবং দেয়ালের গায়ে নৃত্যশীলা-ডাকিনীর মাথায় বৃহৎ ঘড়িটা মিনিট গণনা ক'রে চলেছে টিক্-টিক্-টিক্ ক'রে!

ও-ঘরে প্রবেশ করলে না রণদা। উপরে, উপরে—আরও উপরে! বন্দীদের ঘরগুলি দেখা চাই। যদিও সে-সব ঘর এখনো শূন্য নিশ্চয়ই! বন্দীরাই যদি জীবিত থাকবে, তাহলে নীচের চত্বরে গন্ধকের আরকে ডোবানো রয়েছে কাদের দেহ? ল্যাবরেটরি-ঘরে ঝুড়ি-ভরা, মাঝখানে-চেরা চামড়া-ছাড়ানো মুণ্ডগুলি প'ড়ে আছে তবে কাদের?

তবুও দেখতে হবে। নিশ্চয়কে সুনিশ্চিত করতে হবে। হয়তো অসুস্থ বলেও কাউকে রেহাই দিয়ে থাকতে পারে রুদ্রানন্দ! অসুস্থ পশু তো বলি হয়না, শাস্ত্রমতে!

রুদ্রানন্দ পালিয়েছে, তার কুকীর্ত্তির সঙ্গীরাও নিশ্চয় কেউ উপস্থিত নেই আর এখানে! রণদা অনেকটা নির্ভয়েই অগ্রসর হচ্ছে বই-কি! আগে-আগে চলেছে রণদা! পিছনে চারজন সশস্ত্র সিপাই! আর তিন জন সিপাই নীচের চত্বরে রয়েছে।

বারান্দা বেয়ে নির্ভয়ে অগ্রসর হচ্ছে ওরা। বাঁয়ে সারি-সারি ঘর। ঘরের মেজেতে মা-কালীর বাঁধানো-পট বসানো রয়েছে এখনো। ঐসব পটের সুমুখেই বন্দীদের ধ্যানস্থ দেখেছিল রণদা—আগের বারে। আজ সে-সব বন্দী···

একখানা, দু'খানা, তিনখানা শূন্য কক্ষ পেরিয়ে এসেছে ওরা। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে খোকা-রাজার ঘরখানার ভিতরে তাকিয়ে দেখলে রণদা! সেই ফুটন্ত পদ্মফুলের মতো ছেলেটি সেদিন ঐখানে পটের সুমুখে ব'সে—

দরজাগুলো বাইরের দিকে। ওধারের পাল্লাটা দেয়াল থেকে ফাঁক হয়ে আছে একটুখানি। রণদা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে কেবল পা বাড়িয়েছে, খোকা-রাজার ঘর অতিক্রম ক'রে চলে আসবার জন্যে, এমন সময়ে—

কালকেউটে ফণা তোলবার সময় যেমন হিস্-স্ ক'রে গর্জন ক'রে ওঠে, তেমনি একটা ভয়াবহ চাপা-আওয়াজ শোনা গেল ঐ ও-ধারের হাঁ-করা পাল্লাটার আড়ালে। আর, এরা সব সাবধান হবার আগেই সেইখান থেকে লাফিয়ে এসে ওদের সুমুখে পড়লো একটা বেঁটে মানুষ। হাতে তার ছোট একটা বাল্‌তি।

কী ঘটছে, তা বুঝে ওঠার আগেই রণদার দেহের নিম্নার্দ্ধ জ্বলে উঠলো একেবারে, অদৃশ্য আগুনে! এক বাল্‌তি গন্ধকের আরক ছুঁড়ে মেরেছে তার গায়ে···

খোকা-রাজা!

দশ

রণদার মাথায় চিন্তা করবার শক্তি ফিরে এলো, তিন দিন পরে।

নিম্ন-দেহের অসহ্য যন্ত্রণায় সে পাগলের মতো আচরণ করেছে এ-কয়েকদিন। সময়ে-সময়ে মর্ফিয়া ইন্‌জেকসন দিয়ে অজ্ঞান ক'রে রাখতে হয়েছে তাকে। মোটা কোট-প্যাণ্ট ছিল তার পরিধানে, তাই গন্ধক-জল খুব বেশী তার গায়ে লাগে নি। তবু, বসনের আবরণ ভেদ করেও তা চর্ম্ম স্পর্শ করেছে বইকি অনেক জায়গায়, এবং যেখানেই করেছে—সেখানেই হয়ে গেছে দগ্‌দগে ঘা। মাংস ক্ষয়ে-ক্ষয়ে খসে পড়বার উপক্রম সে-সব জায়গায়!

পিছনে ছিল কনষ্টেবলরা। তারা ছুটে এসে জাপটে ধরে খোকা-রাজাকে। বাল্‌তির সমস্তটা আরকই রণদাকে লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ে মেরেছিল খোকা, তাই অন্য-সকলের আশঙ্কা করবার কিছু ছিল না। খোকাকে শক্ত ক'রে বেঁধে নিয়ে আসে তারা। রণদার কাপড় ছাড়িয়ে তার নগ্ন-দেহ কোনক্রমে বহন ক'রে আনতে হয় সদ্য-গড়ে-নেওয়া ষ্ট্রেচারে তুলে।

যা বলছিলাম, চিন্তা করবার শক্তি কথঞ্চিৎ ফিরে এলো, তিন দিন পরে। আরকের সর্বনাশা-ক্রিয়ার গতিরোধ করেছেন ডাক্তাররা অতি কষ্টে, কিন্তু সেরে উঠতে রণদার

ঢের দিন লাগবে। তবে হ্যাঁ, জীবনের আশঙ্কা কেটে গেছে তার।

আজ রণদা প্রথম জিজ্ঞাসা করলে ওদিককার কথা।

—ওদিককার কথা? প্রথম কথাই হলো—সুব্রতর কোনো সন্ধান হয় নি।

রণদার ব্যাধিক্লিষ্ট মুখের উপর কালো মেঘ নেমে এলো।

দ্বিতীয় কথা: রুদ্রানন্দর কোনো খবর পাওয়া যায় নি, পাতালপুরী অবরোধ ক'রে ব'সে আছে পুলিশ-বাহিনী। আদি-গঙ্গাতীরের মন্দিরে, সুড়ঙ্গের ভিতরে, সর্বত্র পুলিশ পাহারা দিচ্ছে সঙ্গীন তুলে। সামনের ডাঙ্গার পথে খোলার বস্তী ছিল যেখানে, পুলিশ তার-কাঁটা দিয়ে ঘিরে ফেলেছে সেই এক একর জমি, তার ভিতর প্রবেশ নিষেধ। তবে লোহার দেওয়ালের চারদিকে মাটি খোঁড়ার কাজ চলেছে পূর্ণোদ্যমে। পাতালপুরীর ইঞ্জিনীয়ারী-রহস্য আবিষ্কার করা চাই-ই।

হ্যাঁ, আর-এক গুরুতর খবর আছে। পাতালপুরীতে বিজলী আলো জ্বলছে না আর। কোথা থেকে সে আলো আসতো, কী ক'রে প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেল, তা কেউ কিছু বুঝতে পারে নি।

খোকা-রাজা, প্রেসিডেন্সী-জেলের হাসপাতালে। কেবল "মা, মা"—ক্রন্দন তার মুখে। নিজের মা, বা, বাবাকে

দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে! রাণী-মাকে বাড়ী থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল হাসপাতালে। প্রতাপবাবু তো নিজেও আছেন প্রেসিডেন্সি-জেলেই!

প্রতাপ রায় ও তাঁর পুত্র দু'জনেরই চিকিৎসা চলেছে, রামভুজকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তার স্বদেশে।

সমস্ত কথাই শুনলে রণদা, শয্যায় শুয়ে-শুয়ে। যাক্, সব দিকেই উপস্থিত-মতো একটা ব্যবস্থা হয়েছে, হয়নি কেবল সুব্রত সম্বন্ধে কিছু। তাইতো! সুব্রতকে নিয়ে করলে কি ঐ ঘাতক সন্ন্যাসী?

স্পেশাল ব্রাঞ্চ-পুলিশের নীরদবাবু বসেছিলেন রণদার বিছানার ধারে। তাঁরই সঙ্গে চলছিল আলোচনা। নীরদবাবু বললেন—"সুব্রতবাবু বেঁচে আছেন, এ-আশা আমরা করিনে আর।"

বালিশের উপর রণদার মাথা এধারে-ওধারে সঞ্চালিত হতে লাগলো। "উঁহুঁঃ! রুদ্রানন্দর উৎসাহ—বলিদানে, হত্যায় নয়! সুব্রতকে হত্যা করার মতলব থাকলে তো আদিগঙ্গা-তীরের ভাঙা-মন্দিরেই করতে পারতো। যেখানে ছ'টা খুন করেছে রুদ্রানন্দর অনুচরেরা, ছ'টার জায়গায় সাতটা করারই-বা বাধা ছিল কোনখানে?"

একটু থেমে রণদা আবার বললে—"আমার কিন্তু মনে হয় নীরদবাবু, সুব্রতবাবুকে খুন করেনি রুদ্রানন্দ।"

—"তবে কি, গুম্?"—সংশয়ের সুরে বললেন নীরদবাবু।

"তাহলে কি বলতে চান—এই পাতালপুরীর মতো আরো আড্ডা আছে ঐ ঠাকুরের ?"

সে-কথার উত্তর না দিয়ে রণদা কী-যেন নিবিষ্ট-চিত্তে চিন্তা করতে লাগলো। হঠাৎ সে একটা দেরাজ দেখিয়ে দিয়ে নীরদবাবুকে বললে—"খুলুন তো ঐটে !"

নীরদবাবু উঠে দেরাজটা খুলে ফেললেন।

—"একখানা টিকিট আছে ? দেখুন তো, একখানা জাহাজের টিকিট ?" উদ্বিগ্ন-স্বরে জিজ্ঞাসা করলে রণদা।

—"জাহাজের টিকিট ?" সবিস্ময়ে এই প্রশ্ন ক'রে নীরদবাবু দেরাজের জিনিস-কটা ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি হতাশ হয়ে ব'লে উঠলেন—"নেই রণদাবাবু !"

—"নেই তো ?"—উত্তেজিত হয়ে উঠে বসবার জন্যে উদ্যত হলো যেন সে। কিন্তু তারপরই নিজের সাংঘাতিক অসুস্থতার কথা স্মরণ হতেই সে শুয়ে পড়লো আবার শয্যায়। নীরদবাবুকে বললে—"একখানা খামের চিঠি, খামের উপর আমার নাম লেখা আছে ?"

—"নাঃ !"—উত্তর করলেন নীরদবাবু।

—"তাহলে একটা কাজ করুন নীরদবাবু ! ডকে যান এক্ষুণি ! 'হিস্‌পানিয়া' জাহাজ ছাড়বার কথা ছিল তিন দিন আগে। ছেড়েছে নিশ্চয়ই। তাতে সুব্রত চৌধুরী, বা রণদা মল্লিক নামে কোনো যাত্রী কলকাতা ত্যাগ করেছে কিনা দেখে আসুন।"

—"রণদা মল্লিক নামে ?"—স্তম্ভিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন নীরদ।

—"হ্যাঁ, আমাকেই পাঠাতে চেয়েছিল ঠাকুর হিস্‌পানিয়া জাহাজে। আমায় না পেয়ে, সুব্রতবাবুকেই পাঠিয়ে থাকতে পারে। অথবা রণদা-ভ্রমে সুব্রতকে পাঠনোও অসম্ভব নয়। আপনি আর বসবেন না। দেখুন গিয়ে চট্ ক'রে! হিস্‌পানিয়া ঠিক কোন্ পথে কোথায় যাবে, বর্ত্তমানে আনুমানিক কতদূর গেছে জাহাজ, সব শীগগির জেনে আসুন!"

নীরদ উঠতে-উঠতেও প্রশ্ন করলেন—"জাহাজে যাত্রী পাঠানো—পাসপোর্ট, ফটো, এ-সব সংগ্রহ করা তো মুখের কথা নয়!"

রণদা উত্তর দিলে—"রুদ্রানন্দকে এখনো চিনলেন না? ওর অসাধ্য কিছু নেই। কুসংস্কার ও বিজ্ঞানবুদ্ধি, সয়তানী-চক্রান্ত এবং দৈবশক্তি—সবগুলোকেই একসঙ্গে গাড়ীতে জুড়ে হিংসার চৌঘুড়ি হাঁকিয়ে চলেছে ঐ তান্ত্রিক, বিংশ-শতাব্দীর বুকের উপর দিয়ে, অকুতোভয়ে।" নীরদ আর দাঁড়ালেন না।

রণদা চিন্তা করতে লাগলো। লাল-জবার আক্রমণে রণদা নিহত হলো না, হলো নিরপরাধ ভৃত্য রামচরণ। সেই থেকেই রুদ্রানন্দ ধ'রে নিয়েছে যে, রণদার মৃত্যু—মায়ের অভিপ্রেত নয়। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হয়েই রণদার জীবনের উপর আর পুনরাক্রমণ করেননি ঠাকুর। সুহৃৎ মরেছে, রণদা মরেনি। ভগ্ন-মন্দিরে ছয়-ছয়টা পুলিশ

নিহত হয়েছে, কিন্তু রণদা-ভ্রমে সুব্রতকে রেহাই দিয়ে গিয়েছে রুদ্রানন্দের অনুচরেরা।

কিন্তু, তা ব'লে কি রণদাকে স্বেচ্ছা-মতো রুদ্রানন্দের সাধনায় ব্যাঘাত ঘটাতে দেওয়া হবে? কখনো না! তাকে মেরে ফেলা হবে না। কিন্তু দেশান্তরী করা হবে, হিস্‌পানিয়া জাহাজে চাপিয়ে। কার্য্যকালে কিন্তু রণদার বদলে সুব্রতকে নিয়ে বন্দর ত্যাগ করেছে হিস্‌পানিয়া। এজন্যে দায়ী ঐ ঠাকুরের অনুচরেরা। ভুল তারাই করেছে। ঠাকুর নিজে অমৃত-তৈরী নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, এদিকে মনোযোগ দিতে পারেন নি তিনি।

পাসপোর্ট? ঠাকুরের সংগ্রহ ছিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে পাসপোর্ট রণদার কাছে পৌঁছে দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন তিনি। ফটো? তুলে নেওয়া শক্ত কি? রুদ্রানন্দর ইচ্ছাশক্তি সর্বজয়ী। সেই ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে অভিভূত হয়ে সুব্রত হয়তো নিজে গিয়ে ফটো তুলিয়েছেন, নিজে গিয়ে জাহাজে চড়েছেন, "মা, মা" জপ করতে-করতে সানন্দে করেছেন দেশত্যাগ। রণদার দেরাজ থেকে টিকিট ও চিঠি বোধহয় তিনিই সংগ্রহ ক'রে নিয়ে গেছেন।

নব-নিযুক্ত ভৃত্য জিজ্ঞাসিত হয়ে উত্তর দিলে—"হ্যাঁ বাবু। সুব্রতবাবু এসেছিলেন এ-ঘরে। একাই এসেছিলেন। তিন দিন হলো। তিনি আপনার এত-বড় বন্ধু-লোক,

তার উপর পুলিশের এত-বড় 'কর্ত্তা-ব্যক্তি' তিনি, তাঁকে আমি ঘরে ঢুকতে নিষেধ করবো কেন ?"

একে-একে সব মিলে যাচ্ছে। রণদার অনুমান, খাঁটি সত্য। একটুও ভুল হয়নি।

নীরদবাবু ফিরলেন। তাঁর চোখে-মুখে একটা ভয়ার্ত্ত ভাব ; বললেন, "অমানুষিক ব্যাপার, রণদাবাবু! সুব্রতবাবুই গেছেন বটে হিস্‌পানিয়া জাহাজে, তবে রণদা মল্লিক নাম নিয়ে। নাম রণদা মল্লিক, কিন্তু যে ফটোখানি রয়েছে পোর্ট-কমিশনারের অফিসে, সে ফটো সুব্রত চৌধুরীর!"

—"জাহাজ কোথায় ? জাহাজ কোথায় এখন ?"—ত্রস্তে প্রশ্ন করলে রণদা।

—"মাদ্রাজ ছাড়িয়েছে আজ সকালে!"—উত্তর দিলেন নীরদ।

—"যাবে কোথায় জাহাজ ? যাবে কোথায় ?"—আবার প্রশ্ন হলো।

—"যাবে লণ্ডন, কিন্তু আফ্রিকা ঘুরে!"—উত্তর করলেন নীরদ।

—"তবে ? নাইরোবি বা টাঙ্গানিয়াকাতে নেমে সুব্রতবাবু যদি মধ্য-আফ্রিকার জঙ্গলে প্রবেশ করেন ? তাঁর তা আর জ্ঞান-গম্য কিছু নেই। রুদ্রানন্দর ইচ্ছাশক্তি দি তাঁকে আফ্রিকার সিংহের মুখে মাথা গলিয়ে দিতে বলে, াই করবেন উনি!"—হতাশভাবে ব'লে উঠলো রণদা।

—"তবে ? করা যায় কি ?"

—"করা ? আমি যদি কলকাতার পুলিশ-কমিশনার হতাম, এই মুহূর্ত্তে বেরিয়ে যেতাম 'সী-প্লেন' ক'রে। ভারতের উপকূলে থাকতে-থাকতেই হিস্‌পানিয়া জাহাজকে পাকড়াও ক'রে সুব্রতবাবুকে উদ্ধার ক'রে আনতাম ! উঃ ! এই সর্ব্বনাশটা হলো শুধু আমি অজ্ঞান হয়ে থাকবার দরুণ !" —রণদা কপালে করাঘাত করতে লাগলো।

নীরদ তাকে আশ্বাস দিলেন। "আপনি ভাববেন না রণদাবাবু ! আমি কমিশনার সাহেবের কাছে যাচ্ছি। আমার নিজের তো মনে হয়, আপনার পরামর্শই একমাত্র সঙ্গত যুক্তি এ-সময়ে। এ যদি আমরা না করি—সুব্রতবাবুকে আমরা হারাবো।"

নীরদ উঠলেন। পরক্ষণেই তাঁর মোটর-বাইক ভক্-ভক্ আওয়াজ করতে ছুটলো লালবাজার-পানে। রণদা একা আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো। আঃ ! এই সঙ্গীন-মুহূর্ত্তটিতে রণদা রইলো বিছানায় প'ড়ে ! কত-যে কাজ করবার ছিল ! এবং তা সময়মতো না-করবার দরুণ কত দিকে কত যে সর্ব্বনাশ ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে !

সর্ব্বনাশ কত দিকে ঘটতে পারে, তারই হিসাব করতে বসলো রণদা।

প্রথমতঃ প্রতাপ রায়ের একটা কিছু ঘটতে পারে। খোকা-রাজাকে বলি না দিয়ে, মুক্তি দিয়েছে রুদ্রানন্দ।

কেন ? নিশ্চয়ই এর ভিতর সাংঘাতিক দুরভিসন্ধি একটা-কিছু আছে।

দ্বিতীয়ত : রামভুজ দরোয়ান দেশে গেছে। সেখানে সে নিরাপদ থাকবে ব'লে আশা করবার কোনো কারণ নাই। অবশ্য, এখানে জেল-হাসপাতালে থাকলেই যে সে নিরাপদ থাকতো, এমন কোনো কথা নয়। রুদ্রানন্দের গতি সর্ব্বত্রই অব্যাহত !

তৃতীয়ত : ...হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো। নীরদ টেলিফোন করছেন লালবাজার থেকে। রণদার মাথার কাছেই ফোন রয়েছে। সে হাত বাড়িয়ে রিসিভার কানে তুললে। নীরদ বলছেন—"কমিশনার আপনারই পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। আধঘণ্টার ভিতর সী-প্লেন নিয়ে যাত্রা করছি আমরা।"

—"খুব সাবধান !" রণদা উত্তেজনা দমন করবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে-করতে ব'লে উঠলো—"খুব সাবধান নীরদবাবু ! সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখবেন, প্লেনের চালকদের ভিতর কেউ রুদ্রানন্দের খপ্পরে না পড়ে। রুদ্রানন্দকে দেখেন নি আপনারা ! তেজঃপুঞ্জ চেহারা ! টক্‌টকে গায়ের রং, কুচ্‌কুচে চাপদাড়ি, শালপ্রাংশু দেহ !"

ওদিক থেকে হেসে উঠলেন নীরদ—"আরে, আমরা তো সমুদ্রের উপরে হাওয়ার রাজ্যে চলাচল করবো। রুদ্রানন্দ সেখানে আসবে কোথা থেকে ?"

রণদা বললে—"না এলেই মঙ্গল। তবে আসতে পারে না, এমন বিশ্বাস রাখবেন না, নীরদবাবু। রুদ্রানন্দের গতি জলে, স্থলে, ব্যোম-পথে—সর্ব্বত্রই অব্যাহত। আপনারে। প্লেনের এলুমিনাম-প্লেট হঠাৎ ফাঁক হয়ে তার ভিতর থেকে যকে রুদ্রানন্দের আবির্ভাব ঘটে মাঝ-দরিয়ায়, আপনারা আর উঃ! ছোন, অবাক হবেন না দয়া ক'রে!"

নীরদ হাসতে-হাসতে বললেন—"আচ্ছা, আচ্ছা! বি না নমস্কার!"

দিন কাটে অতি কষ্টে। মন ছুটে বেড়ায় দুনিয়ার এধার থেকে ওধার, দেহ কিন্তু পঙ্গু, অচল। এর চাইতে দারুণ যন্ত্রণা আর কিসে? রণদা হাত কামড়ায় নিষ্ফল-আক্রোশে। খোকা-রাজা কী ভয়ানক শাস্তিই যে দিয়েছে ওকে! কী সয়তানী-বুদ্ধি ঐ ঠাকুরের মাথায়! শেষকালে একটা দুগ্ধপোষ্য শিশুর হাত দিয়ে রণদার মতো পুরুষসিংহকে ঘায়েল ক'রে চলে গেল?

প্রায় সন্ধ্যার সময়ে সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শোনা গেল। উৎফুল্ল হয়ে উঠলো রণদা, যেই আসুক, দু'দণ্ড কথা কয়ে বাঁচবে বেচারী। আর, পুলিশের কেউ হ'লে তো কেস-সম্বন্ধেই আলোচনা চলতে পারবে, যার-চাইতে মুখরোচক আর কিছুই নয় রণদার কাছে।

ভিতরে এলেন সুচেৎ সিং। কেন্দ্রীয়-সরকারের অধীন পুলিশ-কর্ম্মচারী ইনি। রণদার সঙ্গে দু'একবার মাত্র

লালবাজারে সাক্ষাৎ হয়েছে। ইনি হঠাৎ রণদাকে রোগ-শয্যায় আপ্যায়িত করতে আসবেন, এটা রণদা প্রত্যাশা করতে পারেনি।

নি দু'একটা কুশল-প্রশ্ন। রণদার দুর্ঘটনার জন্যে আন্তরিক অবসানুভূতিজ্ঞাপন। তারপর সুচেৎ সিংয়ের মুখখানা গম্ভীর থাবয় এলো। তিনি ধীরে-ধীরে বললেন—"হয়েছে কি জানেন, অব্যাবাবু! আরা-জেলার মসনদগঞ্জ ষ্টেশনের পিছনের মাঠে একটা নরবলি হয়েছে।"

অস্ফুট চীৎকার ক'রে উঠলো রণদা। "আরা-জেলা? রামভুজ নয় তো?"

—"হ্যাঁ, রামভুজই বটে। দু'জন পুলিশ তার সঙ্গে ছিল। তারা ওকে ওর বাড়ী-পর্য্যন্ত পৌঁছে দেবে কথা ছিল। অনেক রাত্রে ট্রেন মসনদগঞ্জে পৌঁছোয়। রাত্রিটা ওকে ওয়েটিং-রুমেই কাটাবে, স্থির হলো। ভোরবেলায় রওনা হবে রামভুজের গ্রামের দিকে···সেটা কয়েক ক্রোশ দূরে।"

—"কিন্তু সে-ভোর হওয়ার আগেই—" কথা বলতে গিয়ে কথা আর শেষ করতে পারলে না রণদা। রামভুজের সম্বন্ধে আশঙ্কা তার বরাবরই ছিল। কিন্তু তার মৃত্যু-সংবাদ এসে যখন পৌঁছলো অবশেষে, বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতোই আকস্মিক ও অসহনীয় মনে হলো সেটা।

সুচেৎ সিং বলতে লাগলেন—"হ্যাঁ, ভোর হওয়ার

আগেই অভাগা বাড়ী পৌঁছে গেল। বাড়ী মানে, সর্ব্বজীবের শেষ বাড়ী!"

রণদা কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হয়েছে ততক্ষণে। সে বললে—"ব্যাপারটা খুলে বলুন।"

—"ব্যাপার যেমনটা এখানে সুহৃৎবাবুর বেলায় ঘটেছিল, প্রায় সেই-রকমই। পুলিশ দু'জন অঘোরে ঘুমোচ্ছিলো, জাগলো সকালবেলায়। জেগে দেখে, রামভুজ কোথাও নেই। ওদিকে মাঠের দিকে একটা হল্লা শোনা যায়। ছুটে গিয়ে ওরা দেখে—রামভুজের ধড় আর মুণ্ড পৃথক হয়ে প'ড়ে আছে, মাথার কাছে একটা কালীর পট বসানো, এবং ছিন্ন-মুণ্ডটা আড়া-আড়িভাবে চেরা। গল্পের এই প্রথম, এবং এই শেষ।"

ও রণদার মুখ থেকে শুধু শোনা গেল—"না, শেষ নয়।"

কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে সুচেৎ সিং বললেন—"শেষ হওয়া তো উচিত নয়, জানি। কিন্তু ঐ ধরণের খুন আপনার এই কলকাতা সহরে আরো প্রায় একশোটা হয়েছে ইদানীং। কই, কোনো কিনারা তো হয়নি। আরা-পুলিশও রামভুজের সম্বন্ধে তদন্ত যা করবার করছে। হত্যাকারী-সম্বন্ধে কোনো খবরই বার করতে পারেনি তারা! কোনো সন্দেহভাজন লোককে ও-অঞ্চলে ঘোরাফেরা করতে দেখেনি কেউ। কোনো রক্তমাখা অস্ত্র আশে-পাশে কুড়িয়েও পাওয়া যায়নি। হত্যাকারী এসেছে, খুন-টি করেছে, তারপর

উধাও হয়ে গেছে! রামভুজ কলকাতা থেকে যাচ্ছিলো ব'লে কেন্দ্রীয়-পুলিশের কলকাতা-অফিসে খবর পাঠিয়েছে, আরা-পুলিশ। আপনি রামভুজের ইতিহাস-সম্বন্ধে যতটুকু যা জানেন, এখন বলতে কষ্ট হবে কি আপনার?"

রণদা একমুহূর্ত্ত চুপ ক'রে রইলো। তারপর মৃদুস্বরে ব'লে উঠলো—"কষ্ট নয়, তবে আপশোষ! যাক্ সে-কথা। আমি একটা লম্বা গল্পই শোনাবো আপনাকে। কিন্তু তার আগে একটা কাজ করুন আপনি। প্রেসিডেন্সী-জেলের হাসপাতালে, রামভুজের মনিব প্রতাপ রায় আছেন। তত্ত্বাবধান এবং নিরাপত্তাবিধান, এই দুটো প্রয়োজনে তাঁকে রাখা হয়েছে ওখানে। আপনি জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জানিয়ে দিন—"আজ রাত্রে প্রতাপ রায়ের চারপাশে ঘিরে থাকে যেন সতর্ক পুলিশ, তা নইলে কাল সকালে হয়তো ভদ্রলোককে আর জীবিত পাওয়া যাবে না।"

পূরো একমিনিট স্থির নয়নে তাকিয়ে রইলেন সুচেৎ সিং, রণদার পানে। অবশেষে ফোন তুলে নিয়ে প্রেসিডেন্সী-জেলকে ডাকলেন তিনি। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে প্রতাপ রায় সম্বন্ধে কথা বলতে সুরু করেই ওদিক থেকে কী একটা কথা শুনে চমকে লাফিয়ে উঠলেন তিনি, চীৎকার ক'রে বললেন—"কী? কী? কী! ছেড়ে দিয়েছেন? কার হুকুমে ছাড়লেন প্রতাপ রায়কে?"

এগারো

এই গরমের দিনে বঙ্গোপসাগরে এমন কুয়াশা কেউ কখনো দেখেনি। পাইলট দিক নির্ণয় করছে অতি কষ্টে। মাদ্রাজ ছাড়িয়ে এসেছে প্লেন। আরও অনেকটা গেলে তবে যদি হিস্‌পানিয়ার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়! কলম্বোর আগে ওকে ধরতে পারলে হয়। ঘণ্টায় দুশো মাইল বেগে চলছিল প্লেন, কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত কুয়াশার জন্যে গতিবেগ সংযত করতে হয়েছে।

চার হাজার ফুট নীচে থেকে জাহাজের সাইরেন শোনা যায় যেন। হিস্‌পানিয়া হওয়াই সম্ভব। পাইলট চক্রাকারে নামতে লাগলো সাইরেনের শব্দ লক্ষ্য ক'রে। ভিতরে উজ্জ্বল আলো, বাইরে ঝাপ্‌সা অন্ধকার। প্লেনের সন্ধানী-আলো ঘুরতে-ঘুরতে পলকের জন্যে আলোকিত ক'রে তুলছে—কখনো এদিক, কখনো ওদিক। হঠাৎ কুলদিৎ বাহাদুর চীৎকার ক'রে উঠলো সভয়-বিস্ময়ে। সবাই তটস্থ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কী হয়েছে? হলো কী?"

কুলদিৎ পাইলটের পিছনে ব'সে চারিদিকে লক্ষ্য রেখেছিল। প্লেন চলবার সময় এই-রকম পর্য্যবেক্ষক সর্বদাই থেকে থাকে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তো কুয়াশার দরুণ পর্য্যবেক্ষকের

দায়িত্ব বহুল পরিমাণে বেড়ে গেছে। তা, কুলদিৎ বাহাদুর হুঁসিয়ার লোক!

প্রশ্নের উত্তরে কুলদিৎ সহসা কোনো জবাব দিতে পারলে না। অপ্রতিভ হয়ে আমতা-আমতা করছে সে। অবশেষে বড়কর্ত্তা ধমকে উঠলেন ওকে। "কেন চ্যাঁচালে, তা বলতে কী হচ্ছে তোমার?" এবার আর সত্য কথা না ব'লে উপায় রইলো না বেচারীর। সে মরিয়ার মতো ব'লে উঠলো—"বাইরে একটা লোক দেখলাম যেন, হুজুর!"

সবাই হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন এক নীরদ ছাড়া। নীরদ বললেন—"মানুষ দেখলে? কী-রকম মানুষ? চাপদাড়ি আছে বোধহয়? খুব কুচ্‌কুচে কালো?"

বিস্মিত কুলদিৎ জবাব দিলে—"জী, হুজুর!"

—"এবং খুব ফর্সা রং···গলায় সাদা পৈতে?" আবারও জিজ্ঞাসা করলেন নীরদ।

আবারও বিস্মিত কুলদিৎ উত্তর দিলে—"জী হুজুর!"

নীরদ বড়কর্ত্তার দিকে ফিরে বললেন—"রণদাবাবু আমায় একটা লোকের বর্ণনা দিয়েছিলেন, সে নাকি যোগবলে আকাশে-বাতাসে সর্বত্র বিচরণ করতে পারে। আমি বিশ্বাস করিনি তখন!"

বড়কর্ত্তা একটু নীরব থেকে বললেন—"বিশ্বাস না করার কারণ কিছু নেই। সেক্সপীয়ারের সেই অবিস্মরণীয় লাইন দু'টি মনে আছে তো?"

"More thihgs happen here, Horatio,
Than are dreamt of in your Philosophy !"

দর্শন-বিজ্ঞান যা কল্পনাও করেনি কোনোদিন, এমন জিনিসও দুনিয়ায় ঘটতে পারে, নীরদবাবু!"

হেনরীসাহেব নাস্তিক লোক। ব'লে উঠলেন—"যোগবল কি শেষে একটা খুনে-লোকের উপর ভর করবে গিয়ে? দুনিয়ায় যদি সব-সেরা দুর্বৃত্ত কেউ থাকে, তবে সে হচ্ছে তোমার ঐ চাপদাড়ি এবং পৈতেওয়ালা লোকটি! তার কোনো অসাধারণ শক্তি যদি সত্যিই থাকে, তবে আমি বলবো—ওটা ভগবানের ভুল হয়েছে। অবশ্য, ভগবান ব'লে কেউ কোথাও আছেন তা আমি বিশ্বাস করিনা।"

প্লেন নেমে চলেছে ততক্ষণ, সন্ধানী-আলোক ফেলতে-ফেলতে। কুয়াশাসত্ত্বেও সমুদ্রের ঢেউ চোখে পড়েছে পর্য্যবেক্ষকের। হঠাৎ পাইলট গুরুদয়াল শিউরে উঠলো যেন। চকিতের জন্যে ভীতত্রস্ত ভাবে তাকিয়ে নিলে একবার পিছন-পানে। "কী? কী—হলো?" ফিস্-ফিস্ ক'রে জিজ্ঞাসা করলে কুলদিৎ।

গুরুদয়াল উত্তর করলে তেমনি নিম্নস্বরে—"আমার কাঁধের উপর কে যেন হাত রাখলে একবার, কুলদিৎ! কেমন-যেন লাগছে!"

তার এই ভীত-চকিত ভাব, একজনের চোখ এড়ালো না কিন্তু। তিনি হেনরীসাহেব। ধীরে-ধীরে

ধরে ধরে অতি সাবধানে এগিয়ে এলেন তিনি। কুলদিৎকে উঠিয়ে দিয়ে তার আসনে বসে পড়লেন সন্তর্পণে। কুলদিৎ পিছনে হটে দাঁড়াল।

একমিনিট বাদেই আবার তেমনি ভীত-চকিত ভাবে পিছনে তাকালে গুরুদয়াল। এবার সে থরথর করে কাঁপছে রীতিমতো। প্লেন টাল-খেয়ে ঘুরে গেল একপাশে, আর সেই মুহূর্তে শব্দ হল—"গুড়ুম!"

গুরুদয়াল আর হেনরির দু-খানি আসনের ভিতরে দেড়ফুট মাত্র জায়গা। সে-জায়গা অবশ্য একেবারেই শূন্য! সেই শূন্যস্থান লক্ষ করে হঠাৎ গুলি করেছেন হেনরি। গুলি করেছেন এমনভাবে, যাতে মাঝের ফাঁকা জায়গাটুকু পেরিয়েও যদি যায় বুলেট, তবে তা গুরুদয়ালের গায়ে বিঁধবে না, ওর মাথার উপর দিয়ে বোঁ করে লাগবে গিয়ে প্লেনের গায়ে।

গুড়ুম করে গর্জে উঠল পিস্তল; আর অদৃশ্য-কণ্ঠের ক্রুদ্ধ তর্জনে কেঁপে উঠল প্লেনের আরোহী সবাই। এ রকম গর্জন শুধু আর একজন শুনছিল ইতিপূর্বে। সে হল, রণদা। সামসেরডাঙার পথে ঝাঁকড়া গাছটির তলায় হাওয়া লক্ষ করে সে যখন গুলি ছোঁড়ে, তখন ঠিক এমনিই চিৎকার শুনতে পেয়েছিল সে।

কিন্তু রণদা এখানে নেই। যাঁরা আছেন, তাঁরা স্তম্ভিত, হতবাক। সবাই ছুটে এসে ঝুঁকে পড়লেন গুরুদয়ালের আসনের ঠিক পিছন দিকটাতে। সেখানে তাজা রক্ত!

গুরুদয়াল কাঁধের উপর অশরীরী-স্পর্শ পেয়ে কেঁপে উঠেছিল, কিন্তু কানের কাছে পিস্তলের গুলির শব্দ তাকে বিচলিত করতে পারলে না। পিস্তল-বন্দুক ও-সব লোকের গা-সওয়া জিনিস! সে নিপুণ-হাতে প্লেনের গতি নিয়ন্ত্রণ করে সমুদ্র-বক্ষে নামবার জন্যে প্রস্তুত হল।

এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে ইতিমধ্যে। পিস্তল-আওয়াজের পর থেকেই কুয়াশা কেটে যেতে শুরু হয়েছে অতি দ্রুত। পায়ের তলার সমুদ্র-বক্ষে তখনও কিছু অন্ধকার বর্তমান বটে, কিন্তু দূরে দূরে ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ঝলসাচ্ছে ঝলমল আলোর কিরীট। আর সেই রৌদ্রোজ্জ্বল-সমুদ্রে ধোঁয়া উড়িয়ে ছুটে চলেছে হিস্‌পানিয়া জাহাজ।

সি-প্লেনের মাথায় ভারতীয় পতাকা দেখে ব্রিটিশ পতাকাবাহী হিস্‌পানিয়া তোপধ্বনি করে সাদর-সম্ভাষণ জানালে তাকে। তখন প্লেন থেকে সঙ্কেত করা হল, জাহাজ থামাতে। দুই মিনিটের ভিতরই জাহাজের বেগ মন্দীভূত হয়ে এল।

ঈগল পাখির মতো বৃত্তাকারে নেমে এসে, হিস্‌পানিয়ার ঠিক সুমুখে সমুদ্র-জলে আসন গেড়ে বসল গুরুদয়ালের সি-প্লেন। তারপর ধীরে-ধীরে এগিয়ে এসে লাগল সে জাহাজের গায়ে। সরু লোহার মই লাগানোই আছে সেখানে; বড়কর্তা, ছোটকর্তা ও নীরদ উঠে গেলেন জাহাজে। হেনরিসাহেব পিস্তল হাতে করে বসে রইলেন

মায়ের ডাক

প্লেনের ভিতর। ঐ অদৃশ্য হত্যাকারী যে আর কোনো চাতুরি খেলবার চেষ্টা করবে না প্লেনের উপরে, তার নিশ্চয়তা কি? সময়মতো গুলি ক'রে তাকে নিরস্ত করতে না পারা যেতো যদি, তাহলে তো গুরুদয়ালকে মন্ত্রশক্তিতে অভিভূত ক'রে এতক্ষণ একটা অনর্থ বাধিয়ে দিতো সে! প্লেন বিগড়ে জলে প'ড়ে ডুবে যাওয়াও আটক ছিল না!

—"রণদা মল্লিক আছেন এ-জাহাজে?"—শিষ্টাচার-বিনিময় এবং নিজেদের পরিচয়পত্র পেশ করবার পর বড়কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করলেন জাহাজের কাপ্তেনকে। জাহাজে মালই বেশী, যাত্রীসংখ্যা কম। কাজেই, কাপ্তেন সব যাত্রীকেই চেনেন। হ্যাঁ, রণদা মল্লিক আছেন বই কি! ভদ্রলোককে ঠিক প্রকৃতিস্থ ব'লে মনে হয় না। এমন লোককে আত্মীয়রা কি ব'লে একা-একা বিলাত যাত্রা করতে দিলো, তা কাপ্তেন বুঝে উঠতে পারেন নি।

রণদা মল্লিক নিজের কেবিনে। কাপ্তেন পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন আগন্তুকদের। ঐ তো! কেবিনের ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়ে নীলাকাশে সঞ্চ… …াল্কা মেঘের মালার পানে তাকিয়ে আছেন সুব্রত

সুব্রত এঁদের দেখে … হয়ে গেলেন যেন। একবার এঁদের দিকে, আর-… …র নিজের চারদিকে তাকাতে লাগলেন অসহায়ের মতো। তারপর কি জানি কেন, তাঁর চোখ ফেটে জল এলো হঠাৎ। বন্দী যেন দূর থেকে স্বাধীন-

জগতের ছবি দেখতে পেয়ে, দ্বিগুণিত নৈরাশ্যে ভেঙে পড়েছে একেবারে!

সকলেরই ধারণা ছিল, সুব্রতর তরফ থেকে ঘোরতর বাধা আসবে, তিনি কিছুতেই জাহাজ ত্যাগ করতে চাইবেন না। কিন্তু সকলকে অবাক ক'রে দিয়ে বিনা-প্রতিবাদে সুব্রত এঁদের অনুগামী হতে রাজী হলেন। নীরদ বড়কর্ত্তার কানে-কানে বললেন—"রুদ্রানন্দর মন্ত্রশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে মনে হয়। হয়তো হেনরীর বুলেটই এর কারণ।"

জাহাজের কাপ্তেনকে ধন্যবাদ ও বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে এঁরা একে-একে মই দিয়ে নামতে উদ্যত হয়েছেন, এমন সময়ে একটা ধারণাতীত ব্যাপার ঘটলো ঠিক তাঁদের চোখের সুমুখে, এবং এক সেকেণ্ডের ভিতর। বোঁ ক'রে একটা চক্র দিয়ে সমুদ্র-বক্ষে তরতর ক'রে এগিয়ে গেল তাঁদের সী-প্লেন, প্রায় এক ফার্লং পর্য্যন্ত; তারপর গর্জন ক'রে আকাশ-পথে উঠলো আর-একটা চক্র হাওয়ার বুকে এঁকে দিয়ে! মইয়ের প্রথম ধাপে পা দিয়ে বড়কর্ত্তা এবং তাঁর পিছনে সারিবদ্ধভাবে ছোটকর্ত্তা, সুব্রত ও নীরদ হতভম্ব অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলেন স্তম্ভিত, নির্বাক্।

বিস্ময়ের শেষ ঐখানেই নয়। প্লেন তখনো চোখের সুমুখেই উড়ছে তাঁদের। চেঁচিয়ে কথা কইলে, প্লেনে ও জাহাজে আলাপ-আলোচনাও চলতে পারে তখনো, ঠিক

এমনি সময়ে প্লেন থেকে সবেগে নিক্ষিপ্ত হলো একটি নরদেহ, সেটা পড়লো এসে জাহাজের গা ঘেঁসে।

সঙ্গে-সঙ্গে তিন-চারজন লস্কর ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। হেনরী ডুবে গিয়েছিলেন, কিন্তু লস্করেরাও সঙ্গে-সঙ্গে ডুব দিয়ে মাথার চুল এবং জামার কাপড় ধ'রে টেনে তুললে তাঁকে।

জাহাজের ডেকে তুলে দেখা গেল, হেনরীর কোট লালে-লাল—কাঁধের নীচে ক্ষতচিহ্ন গভীর! হয়তো ছোরার আঘাত!

নীরদ ফিস্-ফিস্ ক'রে বললেন—"রুদ্রানন্দর পতন হচ্ছে! খাঁড়া থেকে ছোরাতে নেমেছে লোকটা!"

সুব্রত হেনরীর দিকে এক-পলক দেখেই হাতে চোখ ঢেকে ব'সে পড়লেন, কাঁপতে-কাঁপতে।

সী-প্লেন তখন অদৃশ্য!

জাহাজের ডাক্তার এসে হেনরীকে পরীক্ষা করলেন। ব্যাণ্ডেজ বেঁধে মাথা নেড়ে বললেন—"এমন কিছু মারাত্মক নয়! তবে গুপ্ত-হত্যার চেষ্টা যারা করে, তারা বিষাক্ত অস্ত্রের ব্যবহার করে অনেক সময়। সে-রকমটা যদি হয়, তবে বলা যায়না কিছু!"

বড়কর্ত্তা এবং জাহাজের কাপ্তেন নিভৃতে পরামর্শ আঁটতে বসলেন। কলম্বোর এ-ধারে আর জাহাজ থামবে না। কলম্বোতে নামিয়ে দেওয়া যেতে পারবে এঁদের। সেখান

থেকে প্লেনে ফিরতে পারবেন এঁরা কলকাতায়। ইতিমধ্যে অয়ারলেস্ টেলিগ্রাফে—কলকাতার হেড-আপিসে খবরটা পাঠানো যেতে পারে।

হেনরীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে নীরদ বললেন বড়কর্ত্তাকে —"দৈবশক্তি কমেছে রুদ্রানন্দর, কিন্তু প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি কমেনি। ওর পতন অনিবার্য্য, এবং আসন্ন।"

বড়কর্ত্তা বিষণ্ণ-কণ্ঠে বললেন—"আমি কিন্তু ভাবছি গুরুদয়াল আর কুলদিতের কি হবে। রুদ্রানন্দ ওদের উপর যদি প্রতিহিংসা নিতে যায়?—অথচ ওরা একেবারেই গোবেচারী!"

বারো

প্রায় পনেরো দিন কেটে গেছে!

হেনরী বেঁচে উঠেছেন। তাঁকে নিয়ে নীরদবাবুরা নিরাপদে ফিরে এসেছেন কলকাতায়। সুব্রত এখনও পূরোপূরি প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠতে পারেন নি, তাঁকে রাঁচী-হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে চিকিৎসার জন্যে। গুরুদয়ালের প্লেন, অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়ে নেমেছে, সে-বেচারীর মাথার ঠিক নেই আর, যখন-তখন ভয় পেয়ে ভীষণভাবে কাঁপতে সুরু করে। অষ্ট্রেলিয়ান-গবর্ণমেণ্টের কাছে পত্র গেছে বাংলা সরকারের—ওখান থেকে পাইলট দিয়ে সী-প্লেনখানা তাঁরা যেন কলকাতায় ফেরত পাঠান।

সুচেৎ সিং, রামভুজের হত্যাকারীর কোনো সন্ধান পান্‌নি এখনো। প্রতাপ রায় হাসপাতাল থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের বাড়ীতে যাননি। সে এক ভয়াবহ রহস্যের ব্যাপার। এ-সম্বন্ধে তদন্তের ভার নিয়েছেন এখন নীরদবাবু। রণদা প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছে, শীঘ্রই তারও সাহায্য পাওয়া যাবে এ-ব্যাপারে, নীরদবাবু এমনি আশাই করছেন।

হ্যাঁ, প্রতাপবাবুর কথা বলি। তাঁকে হঠাৎ কেন ছেড়ে দেওয়া হলো জেল-হাসপাতাল থেকে? না দেবার কোনো কৈফিয়ৎ ছিল না জেল-কর্তৃপক্ষের। প্রতাপ রায়ের পত্নী

দরখাস্ত করেন তাঁর স্বামীর মুক্তির জন্যে। প্রেসিডেন্সী-ম্যাজিষ্ট্রেট্, পুলিশ-রিপোর্ট চেয়ে পাঠান, এবং পুলিশ বলে, তাদের কোনো আপত্তি নেই প্রতাপবাবুর স্বগৃহ-প্রত্যাবর্ত্তনে। অতএব—মুক্তি।

রণদার জোরালো-প্রতিবাদের ফলে, কলম্বো থেকে ফিরে এসে বড়কর্ত্তা এ-বিষয়ের কাগজপত্র তলব ক'রে পাঠালেন। দেখা গেল—হেড-কোয়ার্টার-ডেপুটীর বিশ্বস্ত ইনস্পেক্টর আশীষ মহাপাত্রই সুপারিশ করেছিলেন প্রতাপ রায়ের মুক্তির জন্যে। এবং আশীষ মহাপাত্র সেই থেকে অসুস্থ। অসুস্থতা দেহের অন্য কোথাও নয়, মস্তিষ্কে। ভদ্রলোক পাগল হয়েছেন বললেও ভুল হয় না বিশেষ। ব'লে রাখা ভালো—আশীষ মহাপাত্র ধার্ম্মিক ব্যক্তি, মা-কালীর চরণে অটুট ভক্তি তাঁর।

নীরদবাবু আবার প্রতাপ রায়ের পত্নীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছিলেন এ-সম্পর্কে। দরখাস্ত করার কথা কিছুমাত্র মনে নেই তাঁর। দরখাস্ত তিনিই করেছিলেন শুনে রীতিমতো অবাক হলেন তিনি। কেঁদে বললেন—"এ তাহলে সেই রুদ্রানন্দ-ঠাকুরের কীর্ত্তি। তার মন্ত্রশক্তির বশীভূত হয়ে কোলের ছেলে আমি তার হাতে তুলে দিয়েছিলাম বলি দেবার জন্যে। স্বামীকেও দেবো, এ আর আশ্চর্য্য কি?"

অতএব পুলিশের সুমুখে করণীয় রইলো এখন শুধু—প্রতাপ রায়ের এবং রুদ্রানন্দঠাকুরের সন্ধান। প্রতাপ রায় বেঁচে আছেন কিনা, সন্দেহ। একটিমাত্র অতি ক্ষীণ আশার কথা

এই যে—প্রতাপ মুক্ত হওয়ার পরে অমাবস্যা এখনও আসেনি আর। অপ্রশস্ত তিথিতে নরবলি দেবার মতো জরুরী অবস্থা অতীত হয়ে গেছে ব'লে যদি বিশ্বাস জন্মে থাকে রুদ্রানন্দর মনে, তাহলে সে হয়তো এখনো জীবিত রেখেছে ভদ্রলোককে, আগামী অমাবস্যার প্রতীক্ষায়। সে-অমাবস্যার আর তিন দিন বাকী, কিন্তু রুদ্রানন্দর নতুন সাধনাপীঠ—কলকাতার আশে-পাশেই আছে এখনো, না হিমালয়-শিখরে বা কুমেরু-শিখরের তুষার-প্রান্তরে স্থানান্তরিত হয়েছে ইতিমধ্যে, তা কে জানে!

রণদা প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছে, যদিও চলে-ফিরে বেড়াবার অনুমতি সে ডাক্তারের কাছে পায়নি এখনো। কষ্টও হয় চলতে গেলে, কিন্তু আর শুয়ে থাকাও সম্ভব হচ্ছে না। আর তিনটি দিন মাত্র বাকী। এন্তার পুলিশ-ফোর্স জগৎ-বেড় জাল ফেলেছে সারা কলকাতা সহর নিয়ে, কিন্তু অমৃত-আবিষ্কারক রুদ্রানন্দর টিকিটিও দেখতে পায়নি এখনো।

আজ সকালে রণদা শয্যা ত্যাগ করলে এই সঙ্কল্প নিয়ে যে, আজ থেকেই সে বেরুবে আবার রুদ্রানন্দর সন্ধানে। প্রতাপ রায় যদি মরে থাকেন তো মরেছেন। কিন্তু জীবিত থাকলেও সে জীবনের মেয়াদ আর তিন দিনের বেশী নয়, এ-বিষয়ে রণদা নিঃসন্দেহ। যদি তাঁর উদ্ধারের জন্যে কোনো চেষ্টা করতেই হয়, তবে তা অবিলম্বে। সুহৃৎকে রক্ষা করা যায়নি, রামভুজকেও না! প্রতাপকেও কি বাঁচানো যাবে না?

বেরুবার জন্যে অর্দ্ধেক তৈরী হয়ে এক কাপ চা খেতে বসেছে রণদা ; এইসময়ে এলো খবরের কাগজ। চমকাবার মতো মনের অবস্থা আর কলকাতার সরকারী বা বেসরকারী কোনো গোয়েন্দার নেই আজ। চমক খেয়ে-খেয়ে শেষপর্য্যন্ত অসাড় মেরে গেছে চম্‌কাবার শক্তি। তা যদি না হবে, তবে আজকের কাগজের এই বিশাল হরফের হেডিং দেখেও সে চম্‌কালো না কেন ? হেডিংটা এই রকম ঃ

"সহরে আবার মানুষ চুরি !"

কে এবার ? আধা-বয়সী ভদ্রলোক—নাম আশুতোষ পাকড়াসী। বাড়ী—সামসেরডাঙার দিকে। হ্যাঁ, রণদা বুঝতে পেরেছে লোকটি কে ! প্রথম যেদিন ফুটপাথের উপর অদৃশ্য রুদ্রানন্দকে গুলি করে রণদা, সেইদিনই এ-ভদ্রলোককে দেখেছে সে। বস্তুতঃ এই লোকটিকে উপলক্ষ করেই অদৃশ্য রুদ্রানন্দর সান্নিধ্য রণদা উপলব্ধি করতে পেরেছিল সেদিন।

হ্যাঁ ! বেলা নয়টাতেই রুদ্রানন্দর সঙ্গে চোখো-চোখি ওর। এতদিন জরুরী-ব্যাপারে লিপ্ত থাকাতে ওর সম্বন্ধে মনোযোগ দিতে পারেনি ঠাকুর। আজ আর পিছনে ফেউ নেই, তাই আগামী অমাবস্যার উৎসবটা বেশ সমারোহের সঙ্গেই সম্পন্ন করবার চেষ্টায় আছেন উনি।

প্রতাপ রায়কে এই অমাবস্যার প্রতীক্ষায় বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, এ-ধারণা ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে রণদার মনে।

রণদার পদার্পণ প্রথমে হলো—পাতালপুরে।

রোগ-শয্যায় শুয়ে-শুয়ে রণদা সহস্রবার চিন্তা করছে—পাতালপুরীতে বৈদ্যুতিক-আলোর ব্যবস্থা কি ক'রে করেছিল রুদ্রানন্দ? এবং—এবং ঐ সম্পর্কে অনেক-কিছু!

সুড়ঙ্গমুখের নিকটতম আলোকাধারটি বেছে নিয়ে, সেখানেই কাজ সুরু করলে রণদা। মিস্ত্রী মজুর সংগ্রহ করেই এনেছিল সে। খিলানের গায়ে কাঠের বাতা, তার নীচে ইলেক্‌ট্রিকের তার, সেই তার অনুসরণ ক'রে বাইরের দিকে চললো ওরা।

কূপের গায়ে ইলেক্‌ট্রিকের তার কোথাও নেই। কিন্তু না-থাকাটা সম্ভব হয় কি ক'রে? কূপের গায়ের আংটাগুলির গোড়া খুঁড়ে ফেললে মিস্ত্রীরা। সিমেণ্টের নীচে কাঠের বাতা বেরুলো, তার ভিতরে—তার।

কূপের ভিতর থেকে তার উঠে গেছে মন্দিরের ভিতের গাঁথনিতে। ভিত্ থেকে বেরিয়ে গেছে বাইরের জঙ্গলে। এক ফুট মাটির নীচে দিয়ে সেই তার বরাবর চলে গেছে কালীঘাটের দিকে।

অবশ্য বেশীদূর নয়। জঙ্গলের পর ফাঁকা মাঠ একটা, তারপরই বস্তী। বস্তীতে খুব গরীব লোক বাস করে প্রায় পঞ্চাশ-ঘর। খোলার ছাউনি, মেটে কামরা, কিন্তু তাতে বিজলী আলোর বন্দোবস্ত আছে।

ফাকা-মাঠের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত এলো রণদার মজুরেরা,

তাদের অনুসরণ ক'রে। বরাবর এক ফুট আন্দাজ মাটি তুলে ফেলতে হয়েছে ওদের। এক ফুট নীচে দিয়েই চলে এসেছে তার, মজবুত কাঠের আবরণের ভিতর দিয়ে।

কিন্তু মাঠের মাঝামাঝি এসে পাওয়া গেল একটা গো-ভাগাড়। সেই ভাগাড়ের একপ্রান্তে একটা কবরের মতো ঢিবি, তারপরই লাঙ্গল—বর্ষা-ভূঁই। মজুরেরা ঐপর্য্যন্ত এসে খন্তা-কোদাল ক্ষান্ত ক'রে বিশ্রাম করতে লাগলো। কবরে যদি মানুষের দেহই থাকে ?

পরামর্শ ক'রে তারা ঐ কবরের চারিধার বেড় ক'রে মাটি খুঁড়তে লাগলো। বৃত্তাকারে ঘুরে এলো পরিখা। এপারে আর তার, বা কাষ্ঠাবরণের কোনো চিহ্ন নেই।

রণদা নিজের হাতে কবর খুঁড়তে লাগলো। সত্যিই একটা শিশুর গলিত শব বেরিয়ে পড়লো তা থেকে। পূতিগন্ধ! কিন্তু নাকে কাপড় বেঁধে কাজ করতেই লাগলো রণদা। দেহটা বার ক'রে এনে কবরের তলায় হাতড়াতে লাগলো সে। অকস্মাৎ অস্ফুট চীৎকার বেরুলো একটা রণদার মুখ থেকে। কাঠের বাতার শেষপ্রান্ত পাওয়া গেছে, এবং তার ভিতর তারেরও প্রান্ত। দুটোই কেটে ফেলা হয়েছে তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের আঘাতে।

কবরের তলায় তারের শেষ, কবরের এধারে চষা-ক্ষেত। সম্প্রতি লাঙ্গল দেওয়া হয়েছে এই ক্ষেতে। কবরের কাছাকাছি ক্ষেতের ভিতর দুই ফুট গর্ত্ত ক'রে দেখা গেল

অনেকখানি জায়গা নিয়ে—কোথাও আর তার বা কাঠের বাতার কোনো চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল না।

তার কেটে ফেলবার জন্যে গর্ত্ত করা হয়েছে, এবং সেই গর্ত্তে দেওয়া হয়েছে একটা শিশুর কবর। ওধারের জমির নীচে তার ছিল অবশ্য, সেটা তুলে নিয়ে, গোটা মাঠটাই চষে ফেলা হয়েছে, খোঁড়া-খুঁড়ির চিহ্ন লোপ ক'রে দেওয়ার জন্যে। রণদার হাসি এলো! রুদ্রানন্দ কি গেয়েন্দাদের বালক ঠাউরেছেন, না নির্বোধ?

লাঙ্গল চলে গেছে বস্তী পর্য্যন্ত। শিশুটাকে আবার কবরস্থ ক'রে, সাবানের অভাবে মাটি-জলেই হাত পরিষ্কার করতে হলো রণদাকে। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। মজুরদের বিদায় দিয়ে রণদা একাই প্রবেশ করলে বস্তীর ভিতরে। সহায় শুধু দুই পকেটে দুটো রিভলভার।

খুবই গরীব বস্তী! পঞ্চাশ-ঘর গৃহস্থের জন্যে মাত্র দুটি জলের কলের বন্দোবস্ত। অথচ, আশ্চর্য্য! প্রত্যেক ঘরেই বিজলীবাতি জ্বলছে। বস্তীর শেষে, নাতি-প্রশস্ত আধা-পাকা রাস্তার উপরে একখানি একতলা বাড়ী। তালাবন্ধ!

রণদাকে বস্তীর নোংরা-পথে বিচরণ করতে দেখে দু-চারজন লোক এগিয়ে এলো। বাবুর কি চাই? কাকে চান বাবু?

রণদা একটা গল্প বললে—ঐ মন্দিরের পাশের জঙ্গলটা এবং এই মাঠেরও ও-দিকটা ইজারা নিয়েছে সে। ওটা সাফ

ক'রে ওখানে ছোট একটা বস্তী পত্তন করার ইচ্ছা। জন-মজুর দরকার। এখানে লোক পাওয়া যাবে কি? এবং তাদের মজুরী কত? লাঙ্গল-গোরুও আবশ্যক হবে দু'দিন বাদে, লাঙ্গলটা সাফ হয়ে গেলে। পাওয়া যাবে লোক এখানে?

বস্তীর বাসিন্দারা যুগপৎ কথা কইতে সুরু করলে। কেউ বললে—লোক যত দরকার পাওয়া যাবে। কেউ বললে—এ-সময়ে লোক পাওয়া মুস্কিল হবে। মজুরী কেউ বললে আড়াই টাকা, কেউ বললে, চার টাকা। একটা বিষয়ে সবাই একমত—লাঙ্গল এখানে নেই, পাশের মাঠটাতে সম্প্রতি যে চাষ দেওয়া হয়েছে, সে বহুদূর থেকে লাঙ্গল আমদানী ক'রে।

কে করলে লাঙ্গল আমদানী? কার কাছে খবর পাওয়া যাবে?

এ-প্রশ্নের উত্তরে সবাই বললে—টহলরাম দরোয়ানের কথা। সে এখানে থাকে না। তবে রোজ আসে একবার। বস্তী এবং মাঠের মালিক যিনি—তাঁরই দরোয়ান হলো টহলরাম। এখানকার সব-কিছু খবরদারী সেই করে।

ঐ ঘরখানা কার? ঐ যে তালাবন্ধ রয়েছে? ওটা কি ভাড়া পাওয়া যেতে পারে? বাবুর নিজের থাকবার একটা জায়গা এইদিকে হ'লে ভালো হতো, কারণ, সহর থেকে এসে ঐ জঙ্গলে জল খাটানো খুবই কষ্টকর হবে।

এ-প্রশ্নের উত্তরে সবাই সমস্বরে বললে—ও-ঘর পাওয়া

সম্ভব ব'লে মনে হয় না। মালিকের নিজের ঘর ওখানা। অবশ্য তিনি কখনো ওখানে এসে বাস করেন না। তিনি থাকেন, বিকানীরে। কলকাতায় এলে, বড়বাজারে বাস করেন নিজ-বাড়ীতে। ও-বাড়ীতে তাঁর গুরু এসে ক্বচিৎ-কদাচিৎ থাকেন বটে।

হঠাৎ রণদা লক্ষ্য করলে—লোকগুলি সবাই সোজা সুমুখের দিকে তাকিয়ে আছে—রণদার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী কোনো আগন্তুকের পানে। সবাই যার দিকে তাকিয়ে আছে, কেউ তাকে মুখে একটা সম্ভাষণ জানাচ্ছে না, এ একটা রহস্যের বিষয়। চকিতে রণদা পিছন ফিরে তাকালে। একটা লোক একেবারে রণদার পিঠের কাছে এসে পড়েছে, তার বাঁ-হাতের তর্জনী ঠোঁটের উপরে, এবং ডান-হাতে তার উদ্যত ছোরা। সেই উদ্যত ডান-হাত লক্ষ্য ক'রে সেই মুহূর্ত্তেই গুলি করলে রণদা।

ছোরা প'ড়ে গেল মাটিতে, হাতখানা পড়লো নেতিয়ে। যন্ত্রণার ভ্রূকুটির সঙ্গে বেরিয়ে এলো একটা অস্ফুট ক্রুদ্ধ গর্জন। একটা কুৎসিত গালি উচ্চারণ ক'রে সে সমবেত বস্তীওয়ালাদের ব'লে উঠলো—"চুপ ক'রে দেখছিস কি? ধর্ শালাকে! নইলে জানিস তো ঠাকুরকে!"

সবাই তাকে ঘিরে ফেলবার উপক্রম করছে দেখে, রণদা এক লাফে ডাইনে স'রে গেল চার হাত। সেখানে একটা ঘরের মেটে-দেয়াল। সেই দেয়ালে পিঠ রেখে, দুই হাতে দুই পিস্তল উঁচু করলে রণদা। বজ্রনির্ঘোষে বললে—"বারোটা

গুলি ছিল, এগারোটা আছে এখন। এবার আর হাতে-পায়ে মারবো না, মারবো বুকে বা মাথায়! যার মরতে ইচ্ছে, এগিয়ে এসো!"

আর কেউ আসতে চায় না। এই সুযোগে আহত-লোকটার দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখতে লাগলো রণদা। যেন চেনা মুখ! হঠাৎ তার মনে হলো, এই বোধহয় টহলরাম, এবং এই লোককেই বুঝি-বা পূর্বে একদা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল—সামসেরডাঙা বস্তীর দরোয়ানরূপে, যে-বস্তী ভেঙে খুঁড়ে আবিষ্কার করেছিল পুলিশ—পাতালপুরীর লোহার ছাদ।

চমৎকার যোগাযোগ! রুদ্রানন্দর পাতালপুরীর মাথার উপরে যে জমিদারের জমি, এই বস্তীর মালিকও সেই জমিদারই। একই দরোয়ান ছিল দুই জায়গারই তত্ত্বাবধায়ক! এবং সে দরোয়ান রণদাকে দেখামাত্রই ছোরা তুলেছে তার উপর!

বস্তীওয়ালারা একে-একে স'রে পড়বার চেষ্টায় আছে। রণদার তাতে আপত্তি নেই। গুলি ক'রে-ক'রে মানুষ মারা তার পেশা নয়। সে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করলে—"যার মরবার ইচ্ছে নেই, সে চলে যেতে পারো। বদমাইসি মতলব থাকলেই মারা পড়বে। যাও, চলে যাও!"

এক মিনিট পরে টহলরাম ছাড়া আর কেউ রইলো না ওখানে।

রণদা বললে—"টহলরাম! দু-হাত ওপরে তোলো, তা-নইলে এই করলাম গুলি!"

টহলরাম গজরাতে-গজরাতে হাত তুললে।

রণদা বললে—"আমার দিকে পিছন ফিরে সোজা রাস্তার দিকে এগিয়ে চলো। ডাইনে-বাঁয়ে এক ইঞ্চি স'রে গেলেই গুলি করবো!"

টহলরাম দু'হাত উপরে তুলে চললো এগিয়ে রাস্তার পানে। এবার তার মুখ থেকে স্পষ্ট শোনা গেল—"সারা দিন মাঠ খোঁড়াখুঁড়ি দেখেছি যখন, তখনই পালানো উচিত ছিল। ঠাকুরের উপর ভরসা ক'রে ব'সে থেকেই সর্বনাশ করেছি!"

আগে-আগে টহলরাম, পিছনে রণদা। বাঁয়ে রয়েছে তালাবন্ধ একতলা ঘরখানি! ঘুরঘুট্টি অন্ধকার ও-ঘরের আশে-পাশে। কিন্তু ও কি? ঐ জানলার ছিদ্রপথে অতি সূক্ষ্ম একটা আলোক-রশ্মি ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে যেন?

তেরো

টহলরামকে পুলিশের জিম্মা ক'রে দিলে রণদা—সামসের-ডাঙা ফাঁড়িতে। ওখান থেকেই ফোন ক'রে দিলে নীরদ আর সুচেৎ সিংকে। নীরদকে বললে—বাঁশজুড়ির জমিদার-বাড়ীতে গিয়ে রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সুচেৎ সিংকে অনুরোধ করলে—সামসেরডাঙা-ফাঁড়িতে এসে তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে। তারপর, পাশের দোকান থেকেই কিছু অখাদ্য খাবার এনে দারোগাবাবুর লেখার টেবিলে ব'সে গেল—শূন্য উদর পূর্ণ করবার জন্যে।

দুটো জিনিস মাথায় ঘুরছে তার। তালাবন্ধ ঘরের ভিতর আলো জ্বলছে। এবং টহলরাম বলেছে—'ঠাকুরের ভরসায় ব'সে থেকে ভুল করেছি!' এই দুটো ব্যাপার থেকেই একটা অনুমান গ'ড়ে নিতে হবে। টহলরামকে এখন জিজ্ঞাসা করতে যাওয়া বৃথা। একে তো তার সময় নেই; তার উপর, জিজ্ঞাসা করতে গেলে শেষপর্য্যন্ত হয়তো দেখা যাবে, রুদ্রানন্দর কৃপায় অভাগার স্মৃতি লোপ ঘটে গেছে ইতিমধ্যে।

তালাবন্ধ-ঘরে আলো! এবং টহলরামের উক্তি—'ঠাকুরের উপর ভরসা ক'রে ভুল করেছি!' দুটোর যোগফলে কী পাওয়া যায়? পাওয়া যায় এই যে—ঠাকুর ঐ তালাবন্ধ-ঘরে

আছেন! অথবা, তিনি না থাকলেও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ কেউ আছে!

ও-ঘরে কেউ বাস করে না, ক্বচিত-কদাচিৎ মালিকের গুরু এসে থাকেন শুধু! বস্তীওয়ালারা বলেছে এ-কথা। কথাটা খুব সম্ভব সত্যি। এবং এই গুরুও সম্ভবত রুদ্রানন্দ ছাড়া কেউ নন্।

পাতালপুরীর আশ্রয়চ্যুত হয়ে, ঠাকুর কি এইখানেই এসে উঠলেন শেষে? এত নিকটে? অসম্ভব কী? নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস ওঁর অসাধারণ, পুলিশকে তো গ্রাহ্যই করেন না। গ্রাহ্যই যদি করবেন, তবে একশো আট নরবলি দেবার জন্যে কলাকতা সহরে আসবেন কেন? পাহাড়ে-জঙ্গলে ব'সে তো এ-কাজ অনেকটা নিরাপদেই করা যেতো!

সুচেৎ সিং এসে পড়লেন। সঙ্গে জন-দশেক পুলিশ।

একতলা বাড়ীটার ধারে-ধারে পাহারা রইলো সিপাইরা। ভিতরে ঢুকবার চেষ্টা করতে লাগলো রণদা। ঘরে আর আলো জ্বলছে না এখন। দরজা মাত্র একটি, তাতেই তালা। জানলা অনেকগুলি বটে, কিন্তু সবই ভিতর থেকে বন্ধ। তবে? উপায় কি?

সুচেৎ সিংয়ের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলো রণদা। গুপ্ত-পথ নিশ্চয় আছে ঐ ঘর থেকে বেরুবার। দরজায় তালা তো বন্ধই থাকে! রুদ্রানন্দর যা ক্রিয়াকলাপ, তা দরজা খুলে অনুষ্ঠান করবার মতো বস্তুও নয় মোটেই! গুপ্ত-পথ আছেই।

ঐ গুপ্ত-পথ আবিষ্কার ক'রে নিতে হবে। এবং ধৈর্য্য ধ'রে অপেক্ষা করলে আপনা-থেকেই হয়তো আত্মপ্রকাশ ক'রে ফেলবে ঠাকুর!

দু-ঘণ্টা কেটে যায় কষ্টকর প্রতীক্ষায়।

ইতিমধ্যে নীরদ এসে গেছেন, এবং—কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং—তাঁর সঙ্গে এসেছেন বাঁশজুড়ীর রাণী, প্রতাপ রায়ের স্ত্রী। সুচেৎ সিং অবাক হলেন, সিপাইরা কানাকানি করতে লাগলো—এ বিপজ্জনক অভিযানে নারীর স্থান কোথায়, তা কারোই বোধগম্য হলো না। কিন্তু রণদা নীরদকে ব'লে দিয়েছিল, রাণীকে নিয়ে আসবার কথা, যদি তাঁর আপত্তি না থাকে। রণদার মনে আছে—সামসেরডাঙার পথে একদা রুদ্রানন্দ ডাকিনী লেলিয়ে দিয়েছিল পুলিশের পিছনে এবং সে-বিপদে তারা উদ্ধার পায় শুধু সুহৃদের স্ত্রী এসে পড়েছিলেন ব'লে। আজ যদি আবার অনুরূপ কিছু বিপর্য্যয় ঘটায় রুদ্রানন্দ? সেই আশঙ্কাতেই রাণীকে এনেছে। সাধনা ও নরবলি, দেবত্ব ও পৈশাচিকত্ব এমন ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে এই রুদ্রানন্দর জীবনে, যে, পরম বস্তুতান্ত্রিক গোয়েন্দাও সেই রহস্যঘন জীবনলীলার সংস্পর্শে এসে অনেক অবিশ্বাস্য জিনিসে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে ক্রমশঃ।

রাণী ব'সে রইলেন তাঁর মোটরে। আলো নেই একটুও গাড়ীতে।

দু'ঘণ্টা কাটলো। রণদার হাতঘড়ির রেডিয়াম-কাঁটা

দেখিয়ে দিলে, রাত্রি এগারোটা। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে সবাই। সারারাত্রি এইভাবেই কাটবে না কি? রণদারও এক-একবার মনে হতে লাগলো—হাস্যকর একটা ভুলই সে করেছে বোধহয়। একেই বলে, বুনো হাঁসের পিছনে দৌড়নো!

রাত্রি এগারোটা বেজে গেছে। হঠাৎ একজন সিপাই নিঃশব্দে ছুটে এলো। একটা লোক রাস্তার দিক থেকে এসেছিল। মাথায় একটা, এবং দু'হাতে দু'টো মোট ছিল তার। সে এসে একটা জানলায় টোকা দিলে। অমনি খুলে গেল জানলার একটা পাল্লা। জানলার গরাদ নেই নিশ্চয়ই, কারণ সেই আধেক-খোলা বাতায়ন-পথে ঐ লোকটা ভিতরে চ'লে গেল। মাথার এবং এক-হাতের মোট সে সঙ্গে নিয়ে গেছে, আর-একটা বোঝা প'ড়ে আছে জানলার নীচে।

বিদ্যুৎবেগে ছুটে গেলেন সুচেৎ সিং, রণদা ও নীরদ। ক্ষীণ জ্যোৎস্না ঈষৎ আলোকিত করেছে এই নিঝুম পুরীর চারিপাশ। সেই আলোয় দেখা গেল, একটা বড় সাজি-ভরা জবাফুল প'ড়ে আছে ঘরের পিছনে।

জবাফুল? এই মাঝ-রাত্রে? রণদার অন্তরাত্মা শিউরে উঠলো। তাহলে বুঝি রুদ্রানন্দ আর অমাবস্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজী নয়। আজ সারাদিন রণদা মাঠের ভিতর যে-সব কাজ করেছে, সন্ধ্যার পর বস্তীতে এসে যেভাবে

টহলরামকে পাকড়াও ক'রে নিয়ে গেছে, তাতে ভয় পেয়ে গেছে ঠাকুর। হাতে যে-ক'টি অভাগ্য বন্দী মজুদ আছে, আপাতত তাদের বলি দিয়ে আজ আবার দ্বিতীয়বার পাততাড়ি গুটোতে চাইছে সে, এখানকার আশ্রয় ত্যাগ ক'রে।

ভিতর থেকে খুট্ ক'রে রুদ্ধ-বাতায়ন খুলে গেল। একটিমাত্র পাল্লা। সেই সঙ্কীর্ণ-পথে কাত হয়ে বেরিয়ে এসে একটা লোক সুমুখে ঝুঁকে বসলো। হাত বাড়ালে নীচে থেকে জবাফুলের সাজিটা তুলে নেবার জন্যে। ঘরের দেয়ালের সঙ্গে মিশে দু'দিকে দুটো লোক যে চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিল, তা সে ঠাহর পায়নি। এরা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ভিতরের লোকটার প্রসারিত হাতখানি চেপে ধরলে বজ্রমুষ্টিতে, এবং একটি হ্যাঁচ্কা টানে তাকে টেনে এনে ফেললে বাইরে। হঠাৎ এই টান খেয়ে টাল সামলাতে পারলে না লোকটা, হুমড়ি খেয়ে পড়লো এসে ফুলের সাজির উপরে।

চার-পাঁচজন লোক এসে জাপটে ধরলে তাকে তক্ষুণি। লোকটার গায়ে জোর ঠিক অসুরের মতো। কিন্তু তাহলে কি হবে, এতগুলি আততায়ীর আকস্মিক আক্রমণে কাবু হয়ে পড়লো সে। তার মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেওয়া হলো সঙ্গে-সঙ্গেই।

টর্চ ফেলে দেখলে রণদা—মিশ-কালো যমদূতের মতো চেহারার একটা লোককে। রণদা একে দেখেনি ইতিপূর্বে। এ-হলো সেই ভৈরব, রুদ্রানন্দঠাকুরের বিশ্বস্ত অনুচর।

ভৈরবকে একপাশে টেনে ফেলে, মুক্ত বাতায়ন-পথে রণদা ভিতরে ঢুকে গেল, সুচেৎ সিং আর নীরদকে নিয়ে। ভিতরে ঘর একেবারে খালি। তার ও-ধারে দরজা খোলা, তার ভিতর দিয়ে অন্য-একটা ঘরে এসে পড়লো সবাই। এখান থেকে আবার দু'দিকে দুটো দরজা। ঠিক সুমুখের দরজা দিয়ে সোজা বেরিয়ে গেল সবাই। ডাইনে যে আর-একটা দরজা রয়েছে, সেদিকে খেয়াল করলে না কেউ।

এ-ঘর সে-ঘর ক'রে ঘুরতে-ঘুরতে চললো তারা। একতলা বাড়ীতে যে এত ঘর আছে, বাইরে থেকে তা তো বুঝতে পারা যায়নি! অবশেষে তারা যে-জায়গায় পৌঁছলো, সে এক...

ঘরের মাঝখানটায় ইঁদারার মতো গোলাকার একটা গর্ত্ত। সেই গর্ত্তের ভিতরে আলো জ্বলছে, এবং জ্বলছে—হোমাগ্নি। ধূপ-ধূনোর গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে। গম্ভীর নিম্নস্বরে মন্ত্রপাঠ করছে রুদ্রানন্দ পাতাল-কালীর সুমুখে ব'সে। পাতাল-কালীর আসন ভূগর্ভে বিনা হয় না, তাই রুদ্রানন্দ আপৎকালে ব্যবহারের জন্যে এই ইঁদারা-ঘর আগে থেকে তৈরী ক'রে রেখেছিল।

সুমুখে ঝুঁকে প'ড়ে রণদারা দেখলে, একপাশে সাতজন লোক সারি-বেঁধে ব'সে আছে। মুখে তাদের সৌম্য-প্রসন্ন হাসি, চোখে একটা উৎসুক প্রতীক্ষার আভাস। গলায় সকলেরই টক্‌টকে জবার মালা, কপালে রক্তত্রিপুণ্ড্র।

চিনতে কষ্ট হলো না, লাইনের প্রথম ব্যক্তি প্রতাপ রায়, দ্বিতীয়টি সেই আশুতোষ পাকড়াসী। অন্য লোকগুলি এদের অপরিচিত। এদের বোধহয় সম্প্রতিই সংগ্রহ করেছেন রুদ্রানন্দ, এবং করেছেন এমন অজ পল্লীগ্রাম থেকে, যেখানকার খবর তড়িৎ-ঘড়িৎ কাগজে বেরোয় না।

সহসা পূজা শেষ ক'রে খাঁড়া-হাতে উঠে দাঁড়ালেন রুদ্রানন্দ। ঈশান মারা পড়েছে আদি-গঙ্গার তীরে ভাঙা-মন্দিরে, বলিদানের কর্ত্তব্য তাই রুদ্রানন্দই স্বহস্তে সমাধা করবেন। তিনি স্নেহ-কোমল স্বরে ডাকলেন—"বাবা, প্রতাপ!"

প্রতাপ রায় হাসিমুখে উঠে এলেন। দেবীর সুমুখে হাঁটু-গেড়ে বসলেন এসে। রুদ্রানন্দর হাতে ঝলসে উঠলো খাঁড়া!

সেই মুহূর্ত্তে তিনটে রিভলভার থেকে ছ'টা গুলি গুড়ুম্ গুম্ শব্দে বেরিয়ে গিয়ে বিঁধলো রুদ্রানন্দর দেহে। কোনোটা পিটে, কোনোটা কাঁধে, মাথার পাশ দিয়েও চলে গেল দু'একটা।

কিন্তু রুদ্রানন্দ তো টলে পড়লেন না! ক্রুদ্ধ-নেত্রে তিনি একবার চারদিকে তাকিয়ে নিলেন। "জয় কালী, জয় কালী" —গর্জ্জন উঠলো সিংহনাদে। সে গম্ভীর-স্বরে পাষাণ-হৃদয় পুলিশ-কর্ম্মচারীদেরও অঙ্গে জাগলো রোমাঞ্চ, অন্তর কেঁপে উঠলো আতঙ্কে। মনে হলো সবারই, কোথা

থেকে বুঝি ডাকিনী ভৈরবীর দল আবির্ভূতা হয়ে এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে তাদের উপরে।

রুদ্রানন্দ গুলির আঘাত সামলে নেবার জন্যেই বোধহয় এক মুহূর্ত্তের জন্যে খাঁড়া নামিয়েছিলেন। আবার তিনি হুঙ্কার ক'রে খাঁড়া তুললেন, প্রতীক্ষমান প্রতাপ রায়ের শির লক্ষ্য ক'রে। আজ তিনি আর আত্মরক্ষার চিন্তায় ব্যাকুল নন্। আজ যদি তাঁর জীবনের শেষ দিনও হয়, তবু মায়ের পূজা তিনি সাঙ্গ ক'রে যাবেনই—অন্তিম নিশ্বাস ফেলতে-ফেলতেও।

আবার, আবার গুলি! রিভলভার উজাড় ক'রে ঝাঁকে-ঝাঁকে গুলি! শত্রু-দুর্গের উপর গোলাবৃষ্টি হচ্ছে যেন—অবরোধকারী সৈন্যের কামান থেকে! শত্রু-দুর্গ কিন্তু অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রুদ্রানন্দর দেহে বোধহয় অক্ষত স্থান এক ইঞ্চিও রইলো না। অনাবৃত সুগৌর বৃষস্কন্ধ থেকে স্রোতে রক্ত নামছে, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর!

আবার, তিনবারের বার খাঁড়া তুললেন রুদ্রানন্দ্।

হতাশ হয়ে রণদা চাইলেন সুচেৎ সিংয়ের পানে, সুচেৎ সিং চাইলেন নীরদের পানে। কারও রিভলভারে আর গুলি নেই। তাঁরা লাফিয়ে পড়তে উদ্যত হলেন ইঁদারার ভিতরে। সুমুখে নরহত্যা হবে, এ তাঁরা নীরবে দাঁড়িয়ে দেখতে পারবেন না কখনো। রাষ্ট্র-শক্তির ধারক ও বাহক তাঁরা, নর-হত্যাকে বাধা দেবার চেষ্টায় যদি আত্মবলি দিতে হয় তাঁদের, তাও দেবেন তাঁরা।

আবার উঠেছে খাঁড়া! 'জয় কালী' 'জয় কালী' মুহুর্মুহুঃ নিনাদে ধ্বনিত হচ্ছে সমগ্র বাড়ীটা! রণদারা ঝাঁপ দিয়ে রুদ্রানন্দর উপরে পতিত হতে উদ্যত হয়েছে, এমন সময়ে—

রুদ্রানন্দর ঠিক পিছনে ছিল একটা ক্ষুদ্র মুক্ত দ্বারপথ। তীব্র আর্ত্তনাদ ক'রে সেই পথ দিয়ে তীরবেগে ছুটে এলো এলোকেশী এক নারী। এবং এসেই দুই হাতে জাপটে ধরলে পিছন থেকে রুদ্রানন্দর উদ্যত খড়্গ!

তারপর? রুদ্রানন্দর চোখ থেকে রক্ত ঠিক্‌রে পড়ছে তখন। রক্ত! রক্ত! মহাকালী রক্ততৃষায় জিহ্বা মেলেছেন। সে-রক্ত তাঁকে দিতেই হবে। পিছন ফিরে এক ঝটকায় খাঁড়া ছাড়িয়ে নিলেন তিনি রাণীর হাত থেকে! তারপর—

তারপর? কে তাঁর সুমুখে, তা লক্ষ্য না করেই সেই খড়্গ তিনি আঘাত করলেন রাণীর শিরে!

উপর থেকে হাহাকার ক'রে উঠলো রণদারা! রাণীর পিছনে-পিছনে সিপাইরা কয়েকজন ছুটে এসেছিল ওখানে, তারা একমুহূর্ত্তের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে পিছু হটে দাঁড়ালো! আর, রুদ্রানন্দ সুপ্তোত্থিতের মতো শূন্যনেত্রে চারদিকে তাকাতে লাগলেন বারবার।

কিন্তু সে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র! হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো পায়ের তলায় ভূলুণ্ঠিত দ্বিখণ্ডিত নারীদেহের উপর। তিনি শিউরে এক পা পিছিয়ে গেলেন, তারপর দুইহাতে মুখ ঢেকে থর্‌-থর্‌ ক'রে কাঁপতে লাগলেন ভূতাবিষ্টের মতো!

ততক্ষণে রণদা, সুচেৎ সিং এবং নীরদ লাফিয়ে নেমেছেন। পুলিশ-কর্মচারীরা এসে বেষ্টন করেছে রুদ্রানন্দকে। প্রতাপ রায়কে জোর করে তুলে নিয়ে গেছে একজন। সুচেৎ সিং রুদ্রানন্দর কাঁধে হাত রেখে বললেন—"তুমি বন্দী!"

রুদ্রানন্দ ধীরে ধীরে মুখ তুলে চাইলেন। একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে ও চোখে। ধীরে ধীরে তিনি বললেন—"মা আমাকে বঞ্চনা করেছেন, কিন্তু তা বলে মা ভিন্ন অন্য কারও শাসন মায়ের সাধকের উপর চলবে না! আমার যা সাজা তা আমি মায়ের কাছ থেকেই নেব!"

হঠাৎ রুদ্রানন্দর সারা দেহ জ্বলে উঠল দাউ-দাউ করে। বহ্নিশিখার ভিতর থেকে আর্তস্বর শ্রুত হল দুই-একবার—"মা! মা! মাগো! আমায় কোলে নে মা, কোলে নে!"

* * * *

রণদারা যখন সুমুখের দরজা দিয়ে ইঁদারার দিকে চলে গেল, তখন প্রকাণ্ড একটা ভুল করলে তারা। ডাইনের দরজা হল পূজা-কক্ষের প্রবেশপথ।

ভিতরের পিস্তলের শব্দ মোটরে-প্রতীক্ষমানা রানির কানে পৌঁছল। স্বামীর জন্যে উৎকণ্ঠিতা তিনি, এইবার সে উৎকণ্ঠা পাগল করে তুললে তাঁকে। তিনি দ্রুত মোটর থেকে নেমে ভিতরে ঢুকলেন। পুলিশ প্রহরীরাও সঙ্গে ছুটল তাঁর। রানি কিন্তু রণদার মতো ভুল করলেন না, নিয়তির নির্দেশে ঠিক পথই ধরলেন তিনি, তাই নিজের প্রাণ বলি দিয়ে স্বামীকে রক্ষা করবার সুযোগ তিনি পেলেন।

রণদা ঠিকই ধরেছিল—রুদ্রানন্দর শক্তিতে ব্যাহত করবার মতো একটা জিনিসই দুনিয়ায় ছিল, সে হল, সতীর শক্তি!

বিচারে ভৈরবের হল ফাঁসি, যোগজীবন আর টহলরামের দীর্ঘ কারাবাস।

যোগজীবনের মুখে পাতাল-কালীর ইতিহাস কতকটা জানা গেল। উনি নাকি রাক্ষস-রাজ রাবণের ইষ্টদেবী। অর্ধ-সহস্র-বর্ষ পূর্বে বাংলার কোনো বণিক-রাজ লঙ্কা থেকে এনে ওঁকে সুন্দরবনের ভূগর্ভে প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে সেই বিস্মৃত ভূগর্ভ-মন্দিরের মাথার উপরে গড়ে ওঠে প্রাসাদ-নগরী কলিকাতা এবং একদা মায়ের প্রত্যাদেশ লাভ করে যোগী রুদ্রানন্দ হিমালয় শিখর থেকে নেমে এসে মায়ের পূজায় আত্মনিয়োগ করেন। অমৃত-আবিষ্কারের উপায়-স্বরূপে একশো আট নরবলির বিধান তিনি মায়ের প্রত্যাদেশ থেকে লাভ করেছিলেন, কিংবা ওটা ওঁর নিজস্ব ধ্যানলব্ধ ব্যক্তিগত বিশ্বাস, তা যোগজীবনের জানা ছিল না।

ভারত-সরকারের আদেশে পাতাল-কালীকে আবার তাঁর ভূগর্ভ-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হল। সেখানে তাঁর নিত্য-পূজা এখনো হয়, অবশ্য নরবলির ব্যবস্থা আর নেই।

সমাপ্ত